

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ । ୨୦୫ ପୃଷ୍ଠା, ୧୯୫୧

ପ୍ରଚ୍ଛଦ । ସମଗ୍ର ସଂସ୍କରଣ

ନବ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶନୀ ୧୨୪/୧ଏ, ଗଜା ଗଳ୍ପଯୋଗନ ମନ୍ତ୍ରୀ
କଲକତ୍ତା ୯ ହିନ୍ଦି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଓ ଫୋଟୋ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରକାଶନ
ଓ ସର୍ବସ୍ୱତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୫୧, ମୁଦ୍ରା ମେନ
ମାଧ୍ୟମରେ, କଲକତ୍ତା ୯ ହିନ୍ଦି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଓ ଫୋଟୋ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରକାଶନ ।

କୌଣ-ବିକଳ ୧

କନ୍ଦୁକର ବନ୍ଧ ୫୦

କନ୍ଦୁକେ ୫୫

କାବି ୫୨

ଆମରା ହାସ୍ୟକବିତା ଓ ଏକାଠି ଯେତେ : ୫୨

କନ୍ଦୁକ ୫୩

ନାଟକ ୫୫

ପ୍ରଥମ ପଥ ୧୦୫

ହାସ୍ୟ-କବିତା ୧୫୫

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ

অনুবাদ

- লু সূনের নির্বাচিত প্রবন্ধ ॥ বন টেক
লু সূনের কবিতা বুনো ঘাস ॥ পাঁচ টেক
চীনের কালজরী বিশেষ গল্প ॥ বন টেক
চীনের প্রাচীন সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ॥ বন টেক
ডৌ এন লাই-এর কবিতা ও শিল্প-ভাবনা ॥ পাঁচ টেক

সম্পূর্ণ উপন্যাস

- দুই ঠিকানা ॥ সাকন চট্টোপাধ্যায় ॥ বারো টেক

কাব্যগ্রন্থ

- বিশ্রান্ত ॥ অমিত্যজ চট্টোপাধ্যায় ॥ ছয় টেক
শস্যের অকরে ॥ অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ পাঁচ টেক

সম্পাদকের কথা

ম্যাক্সিম গোর্কিকে লেখা বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও মনীষী রুশিয়ায় একটি চিঠির অংশ বিশেষ দিয়ে শুরু করা যেতে পারে।

‘...এক শীতের ভীটার টানে আপনার আবির্ভাব, যখন মহাবিশ্বের জ্যেষ্ঠ সবে বসন্তের মৃদু পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এই কাকতালীয় ঘটনাটি আপনার জীবনে গভীর অর্থবহ কারণ জীর্ণ-পুরাতন পৃথিবীতে জন্মও নতুন বিশ্বের সঙ্কেত-ঝড়ে আপনি ক্রমবর্ধমান হয়েছেন। অতীত ও বর্তমান—বুই পৃথিবীর জাগরণে আপনি ঘাঁড়িয়ে আছেন ধীরে এক সেতুর মত। আমি সেতুটিকে অভিনন্দন জানাই। এ সেতু আকাশচুম্বী। আমাদের নতুন প্রজন্ম যুগে যুগে প্রাণ ও বিস্ময়ে এই সেতুর দিকে তাকিয়ে থাকবে...।’

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে নিকলিন-নভোগর্দের প্রমিক আলোচনী পেশকভ যখন ম্যাক্সিম গোর্কি ছদ্মনামে প্রথম গল্প লেখেন, তাঁর বয়স মাত্র চম্বিশ। ইতিমধ্যেই বিচিত্র জীবন ও জীবিকার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর পাঠশালায় যে রুচ, তিক্ত ও সুগভীর অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছিলেন, বিশ্বের খুব কম লেখকের ভাগ্যেই তা ঘটে। ম্যাক্সিম গোর্কির জীবন অগণিত পাঠকের কাছে সুবিদিত। শুরু একটি বিশেষ ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যা গভীর তাৎপর্যবহ। উনিশ বছর বয়সে, গোর্কি যখন কাজানে এক রুটি কারখানার প্রমিক, লেনিনের নেতৃত্ব সেখানে এক ছাত্র-বিদ্রোহ ঘটে। এই বিদ্রোহ ধমন করতে, ছাত্রদের পর আসুদিক বলে চড়াও হয় কাজানের রুটি-প্রমিকরা, গোর্কি যাদের গভীর আস্থা নিয়ে বোঝাতেন সমাজ পরিবর্তনের কথা। গোর্কির আস্থাভাজন এই প্রমিকরা যখন এই ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হয়, বৃষ্টি বেধনায় গোর্কি কাজাঙ্কা নদীর তীরে নিজের বৃকে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন। সূতের বিষয়, গুলি তার ফুসফুস বিদ্ধ করতে পারেনা এবং গোর্কিকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করলে, ঐ প্রমিকরাই গভীর ভালোবাসা ও মমতা নিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ায়। ‘ঐ সব প্রমিকদের

বহুশে গোর্কি লক্ষ্য করেন আগামী দিনের ইতিহাস। যেখানে পান সামাজিক পরিস্থিতি কেমনভাবে মানুষকে পশুত্ব পরিণত করে। সদুন্নয়ন জীবন-ধারণার পরিবর্তন অংশগ্রহণ। এ অভিজ্ঞতা তাঁকে নতুন কর্মে নিয়োজিত করে, জীবনের এই বিপুল অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি স্থির থাকতে পারেন না, বাধ্য হন কলম ধরতে।

শুরুতে তিনি প্রধানত ডল্যা অঞ্চলের কাগজপত্রেই লিখতেন এবং ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে গোর্কির প্রথম গল্পগ্রন্থ Sketches and Stones যখন প্রকাশিত হয়, স্নাতকোত্তর সারা দেশের পাঠক নতুন প্রতিভার চমকে যায়। এর পর উপন্যাস Foma Gordeyev, The Three এবং নাটক The Lower depth প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার খ্যাতি দেশ-কালের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্ব সাহিত্যের আঙ্গিনায় পৌঁছে যায়। গোর্কির Foma Gordeyev, টেলস্টয়ের Resurrection এর মতই সমানভাবে রুশদেশে আলোড়ন ও চাকল্য সৃষ্টি করেছিল।

গোর্কির এই প্রথম পর্বের লেখায় এক্ষণে আমরা পাই সরল মানবিকতা, প্রমিত, ভাবধারে, পতিতা—রাশিয়ার জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশের বৃথ-বস্ত্রা, বস্ত্রনা, হতাশা ও শোষণের ছবি, অনাবৃত্ত মালিক, ব্যবসায়ী, বিজ্ঞানদের স্বল্প, লোভী ও সর্বগ্রাসী লুট ও ক্রমতার চিত্র। এইসব চরিত্রগুলো গোর্কি এত গভীর ও আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, নাটক, উপন্যাস ও গল্পে তা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। My Travelling Companion, Twentysix men and a girl, Kononov, Kolusha প্রভৃতি প্রথম পর্বের গল্প এ ছবিগুলোই সম্পন্ন।

বিশ্ব শতাধীর সূচনায়, ১৯০০ খৃস্টাব্দে, The Three উপন্যাসের মধ্য দিয়েই গোর্কির নতুন জীবন-বর্ণন ও সাহিত্যের সূচনা লক্ষ্য করা হয়। তাঁর প্রথম পর্বের গল্প Old Izergil এর রূপকাহিনীই বাস্তব পৃথিবীতে The Three এর মধ্যে সংগঠিত হল। নতুন পৃথিবীর অস্পষ্ট আভাস পাওয়া গেল এই উপন্যাসের মধ্যে। এরই স্পষ্ট, চূড়ান্ত রূপ হিসেবে ১৯০৬ খৃস্টাব্দে আবির্ভূত হল Mother। Mother উপন্যাসের চরিত্র-বিচারের কথা এখানে থাক, পৃথিবীর আর কোন উপন্যাস এভাবে সমাজকে আলোড়িত করেনি। দেশে দেশে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে অত্যাশঙ্কক হয়ে ওঠেনি।

প্রথম পর্বে গোর্কি প্রমিতপ্রণীর শোষণ-বস্ত্রনা সূক্ষ্মভাবে চিত্রিত করলেও, প্রেরণী হিসেবে প্রমিতদের ক্রমতা ও আগামী বৃদ্ধির নিরন্তর হিসাবে,

জনগণের বিবেকের প্রহরী হিসেবে, ভ্রমিকদের লুণ্ঠারিত শক্তির সম্মান পাননি। সে জন্যই গোর্কির সাহিত্য-জীবনে Mother বিশিষ্ট স্থান অর্জন করে আছে। সরল মানবিকতা থেকে গোর্কি উত্তীর্ণ হন শ্রেণী-মানবিকতার। যখন মা সোচ্চারে বলার ক্ষমতা অর্জন করেন—‘They can’t kill my spirit—my living spirit’।

গোর্কির হৃদয়ভঙ্গির এই গভীরতা ও নবরূপ আনয়নে রাশিয়ার ১৯০৫-এর অসমাপ্ত বিপ্লব আশ্বিত হরে যায়। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গোর্কির বিশ্ব-দৃষ্টি ও নাস্ত্রানিক বোধের হৃদ্যে সুস্পষ্ট মতামত আমরা পাই। তিনি বিশ্বাস করেন বিপ্লবী পরিবর্তনের মধ্যে জনগণের সঙ্গে একাত্ম হলেই আত্মার পুনর্জাগরণ ঘটবে, বিপরীতে, সামাজিক ও ঐতিহাসিক বড়-বড় উপেক্ষা করে জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় ‘বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ববাদ’। Mother উপন্যাস প্রথম ধারার ফসল, দ্বিতীয় ধারায় তিনি সৃষ্টি করেন বিশ্ব-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস Life of Klim Samghin। চারখণ্ডে লিখিত এই উপন্যাসে গোর্কি বোঝিয়েছেন ‘সাময়িক-বাদ’ কিভাবে মানুষের আত্মিক মনোভাব ও পুনর্জাগরণে বাধা সৃষ্টি করে।

এই শ্রেণী-মানবতাবাদই পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার জন্ম দেয়। সাহিত্যধারায় এই দ্বিতীয় পর্বে গোর্কির অন্যতম উল্লেখযোগ্য গল্প A man is Born, The Creepy Crawlies, First Love; উপন্যাস The Artamonovs, আত্মজীবনীমূলক Trilogy উপন্যাস এবং নাটক।

১৯২১ খৃস্টাব্দে, বিপ্লবের পর, লেনিনের উপদেশে গোর্কি ইতালিতে বিদ্রাম করতে যান। ক্ষত ফুসফুস তার স্বাস্থ্যে উৎসেগ সৃষ্টি করছিল। এই পর্বেই সৃষ্টি হয় Tales of Italy। গোর্কির স্বাস্থ্যের ক্রম অবনতি ঘটতে থাকে কিন্তু নতুন সোভিয়েত গঠনে তার পরিচয় চতুর্দশ বেড়ে যায়। শব্দ, গল্প, উপন্যাস নয়, সাংবাদিকতা থেকে শব্দ করে নতুন লেখকসৃষ্টির ধারিণ, লেখকসংঘ গঠন, সোভিয়েতে নানা জাতির সাহিত্য-বিকাশে গোর্কি অক্লান্ত পরিচয় করেন। ১৯২৮ এর পর স্বাস্থ্যের ক্রম অবনতি ঘটলে প্রতিবছর ইতালির আবহাওয়ায় কিছু দিন কাটিয়ে আসতে যান কিন্তু ১৯৩০ এর পর পাকাপাকি সোভিয়েতেই বসবাস শব্দ করেন। ইতিমধ্যে জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থানে গোর্কি বিশ্বের শান্তিপ্রিয় ও সুস্থ বিবেক-সম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনে কাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্যের কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় না। ১৯৩৬ খৃস্টাব্দে গোর্কি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর পূর্বকালে তাঁর শেষ কথা উচ্চারিত হয়েছিল ‘There’ll be wars... We must be prepared!’ Old Izergil-এর Donko চরিত্রটির মতই তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন।

সীমিত আর্থিক ক্ষমতার নব সাহিত্য প্রকাশনী গোর্কির প্রেস্টগম্প প্রকাশে
 রতী হয়েছেন। এর আগে লু স্টান-এর প্রবন্ধ ও কবিতার সংকলন এরা
 প্রকাশ করেন। প্রকাশনার জগতে এ এক নূহ লক্ষণ। প্রেস্টগম্প বিচারে সর্ব-
 কালেই বিমত থাকে স্বাভাবিক। এ শ্রাধীনতা প্রকাশকের। তবে এ সংকলনে
 গম্প বাছাইয়ে বেঁধারা অনুসৃত হয়েছে তা হল গোর্কির প্রথম পর্বের সাহিত্য
 অর্থাৎ সরল মানবতাবাদ-এর কিছু গম্প এবং দ্বিতীয় পর্বের উল্লেখযোগ্য
 কিছু গম্প যেখানে গোর্কি শ্রেণী-মানবতার পথ ধরে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার
 দিকে চিন্তা ও মননকে প্রসারিত করেছেন।

প্রথম পর্যায়ে পড়ে, Song of falcon, Twentysix men and a
 girl, Poet, Reader, Kalusha ইত্যাদি, দ্বিতীয় ধারায় আছে, A man
 is born, Creepy Crawlies, Comrade, First love ইত্যাদি।
 গম্পগুলো অনুবাদ করেছেন সমর ঘোষ। অনুবাদ সাহিত্যে সমর ঘোষ
 ইতিপূর্বে বেশ কিছু কাজ করেছেন যা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণীয়।

পান্ডুলিপি সাজানো-গোছান এবং বিভিন্ন সময়ে প্রুফে ও পরামর্শে
 সাহায্য করেছেন জয়ন্তী ঘোষ, অমল চক্রবর্তী, শ্যামল মৈত্র, অরুণ মুনোপাধ্যায়
 প্রমুখ। এছাড়া বিশেষ করে সাহায্য করেছেন 'অঙ্কুর' প্রেসের মৃণাল বিশ্বাস,
 কুক বোস ও কমলেশ্বর। গোর্কির সাহিত্যের সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠক কিঞ্চিৎ
 পরিচিত হলেও নতুন প্রজন্মের কাছে এমন একটি গম্প সংকলনের প্রয়োজন
 ছিল। নব সাহিত্য প্রকাশনী এ ব্যাপারে সহযোগিতার হাতে এগিয়ে এসেছেন,
 আশা করি গ্রন্থটি পাঠক সমাজে বহু দিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে।

জীর্ণ-বিকল

গ্রীষ্মের এক অসহ্য রাত । শহরতলীর নিজ'ন রাস্তার অশ্রুত ঘটনাটা আমার নজরে পড়েছিল ।

জনৈক স্ত্রীলোক পচা ডোবার পাকৈ পা দু'বিয়ে নাচছে, কাধা ছাঁড়ছে আর স্থলিত-কণ্ঠে গাইছে অশ্লীল গান । বিকেলের প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির পর রাস্তা-ঘাট কদমাস্ত । উপরন্তু ডোবাটা গভীর বলে স্ত্রীলোকটির হাঁটু অবধি ডোবা । আওয়াজ শুনে মনে হয় ও মাতাল । এ ভাবে নেচেকু'মে শ্রান্ত হয়ে পড়লে, গাড়িয়ে পাকৈ ডুবে মরা ছাড়া গত্যন্তর নেই । তাই দ্রুত পায়ের বটুটা খুলে আমি সরাসরি কাদার মধ্যে নেমে এলাম । হাতদুটো টেনে ডাকায় তুলে আনতে মদহতের বিজ্বলতায় চুপটি মেরে থাকলেও সহসা এক ঝটকায় হাতদুটো ছাড়িয়ে নিল । বঁকে একটা ধাক্কা দিয়েই বিকৃত গলায় বলল, 'উপকার !' এবার সে আমাকে টানতে টানতেই নেমে গেল ফের ডোবাটার মধ্যে । গজ গজ করে উঠল, 'গোল্লায় যা ! আমি উঠব না । তোকে ছাড়াই আমার চলবে... তুই নিজের পথ দেখ...উপকার করতে এসেছে ।'

রাস্তার চৌকিদারটা হঠাৎ কোন এক অশ্বকার অংশ থেকে ঝুপ করে সামনাসামনি দাঁড়াল । রুদ্ধ গলায় হাঁকি ছাড়ল, 'এত হৈছে কিসের ?' ডুবে মরার হাত থেকে ওকে উদ্ধারের কথা বলতেই, সে স্ত্রীলোকটার দিকে তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে একদলা থুতু ফেলে বলল,—'উঠে আয় মাশকা ।'

'না—'

'ওঠ...ওঠ বলছি—'

'উঠব না—'

'বিনা পিটুনিতে তুই উঠবি না মাগী'—দাঁতে দাঁত ঘষে কথাকটি বলেই মদে হেসে আপনজনের মত আমাকে বলল, 'পাশের বাঁশুতে থাকে...কাগজ কুড়োয়...মাশকা জালখা নাম...তুমি খুব হাঁপিয়ে গেছ মনে হচ্ছে ?' পরস্পর

আমরা সিগরেট ধরলাম। স্ত্রীলোকটি পাকের মধ্যে নাচাকুঁদো করে চৌঁচরুই
বাঁকে, 'মাতব্বারি করতে এসেছে ! কারও সাহায্যের দরকার নেই। দরকার
হলে কাছার ডুব দেব আমি।'

'এবার কিস্তি চুলের মৃঠি ধরে চুবোব'—চৌকিদার সাবধান করে দিল।
তার চেহারাটা গাটা-গোটা, মূখে একগাল দাড়ি, বয়স প্রায় পঞ্চাশের ওপর।

'প্রতি রাতে রাস্তায় এমন মাতলামি ! বাড়িতে যে খোঁড়া ছেলেটা
হাঁপিয়ে মরছে, খেলাল আছে...?'

'ঘরটা কত বড় ?'

আমার এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কিসের এক চাপা উত্তেজনার বলল,
'মেরে ফেলাই মাগীটার উপযুক্ত শাস্তি।'

'যাক, ওকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় কি করে ?'

আমার এ কথায় চৌকিদারটি কিসের সম্বোধে দাড়ির গোছা মূঠোর
চাপতে চাপতে, আমার প্রতি বক্তৃদ্ধি হেনে কাছা ভেঙ্গে আপন কর্তব্যে
চলে গেল। শুনতে পেলাম বলছে, 'ইচ্ছে হচ্ছে যখন নিয়ে যাও।—সব
কিছুর আগে মূঠের দিকে তাকিয়ে নিও একবার।'

পাক বসে স্ত্রীলোকটি তখন হাত দুখানা দুদিকে দোলাচ্ছে আর কাঁপা-
গ-গাম চেঁচাচ্ছে, 'দাঁড় বাইছি—সমুদ্রে—সমুদ্রের মধ্যে।'

অন্ধকার আকাশে রাস্তার নোংরা জলে তারার ছায়া। একটু নাড়া-চাড়া
হতেই সে ছায়া মিলিয়ে যায়। আমি ফের পাক ঠেলে, স্ত্রীলোকটিকে
পাঁজাকোলা করে, হাঁটুর মৃদু ধাক্কায় ডাক্সায় তুলে আনলাম। সে বাধা দিল,
হাত পা ছুঁড়ল, শেষে শরীরটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'মার আমাকে, আরো মার।
ভয় পাই বুদ্ধি ! জানোয়ার...হতচ্ছাড়া...আর মার আমাকে।' আমি টেনে
তুলে, দাঁড় করিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলাম তার বাড়ির কথা। সে
একবার নেশাগ্রস্ত মাথাটা তুলে ধূসর-ঝাপসা চোখে আমার মূঠের দিকে
ডাকল। নাকের বাঁশটার করিঁজু অগ্রভাগ শূন্য জেগে আছে বোতামের মত।
উপরের ঠোঁটটা স্থায়ী একটা ক্ষতের জন্য কুঁকড়ে ঠেলে ওঠার, বেরিয়ে আছে

একপাটি সরু দাঁত । গোলগাল ছোট মৃদুখানা আমার দিকে মৃদুত্বের দৃষ্টি
বিনিময় করে বলল, 'বৈশ...চলে এস' । আমরা পাশাপাশি চলতে লাগলাম ।
ওর স্কাটের ভেজা প্রান্ত আমার পারে জড়িয়ে থাকল ।

'চলে এস প্রিয়তম'—তার গলাটা ফ্যাসফ্যাসে—চেষ্টা করে মোলারেম
করে তুলছে । 'ভালই লাগবে তোমার...আমার কাছে শান্তি মিলবে ।'

সে আমাকে মস্ত এক দোতলা বাড়ির উঠানের সামনে নিয়ে এল ।
ইতস্তত ছড়ান ঠেলাগাড়ি, পিপে, প্যাকিং-বাক্স, কাঠের স্তুপের ঘাপ-ঘুপাচির
মধ্যে দিয়ে, নিঃশব্দে, অশ্রদ্ধ মত স্ত্রীলোকটি একতলার এক অশ্রদ্ধার গদুহার
সামনে আমাকে বাড়ি করিয়ে দিল ।

'নেমে এস ।'

ভাঙ্গাচোরা দেয়ালে ভর দিয়ে, অন্য হাতে টলে-পড়া ওর দেহটাকে সামলে
আমি পিচ্ছিল সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলাম । হাতড়ে হাতড়ে পর্বর কাছে
দরজার কড়া পাওয়া গেল । খাড়া দিতেই একতাল ঘন অশ্রদ্ধার ; আর
যাওয়া উচিত কিনা ইতস্তত করতই, গভীর অশ্রদ্ধার থেকে ক্ষীণ স্বরে ভেসে
এল, 'কে ? মা নাকি ?'

'আমি—'

সহসা ভ্যাপসা, পচা মৃদুগন্ধ নাকে ভেসে এল । দিয়াশলাই-এর কাঠি
জ্বালার শব্দ হতেই ক্ষীণ আলোক-শিখায় একটি শিশুর পান্ডুর মৃদু চকিতে
চোখের সামনে ভেসে উঠল ।

'আর কে আসবে ?...আমিই'—স্ত্রীলোকটি আমার কাঁধে ভর করে ওকে
শূন্যে শূন্যেই জবাবটা দিল ।

আবার একটা জ্বলন্ত দিয়াশলাই-এর কাঠি । আলোতে দেখা গেল অশ্রু-
চর্মসার একটি ছোট হাত চিমনি-ঢাকা ছোট কুপিটি জ্বালাচ্ছে ।

'আমার বাছান্না !'—বলেই স্ত্রীলোকটি টলতে টলতে ঘরের কোণায়
ধপাস করে শূন্যে পড়ল । ওখানে মেঝেতে তৈরী আছে ছেঁড়া কাপড়-চোপড়ের
মস্ত এক বিছানা । ছেলোট কুপির পলতে বাড়িয়ে দিতেই আলোটা ধুমারিত

হয়ে আরও উজ্জ্বলভাবে জ্বলতে লাগল। ওর মৃদুস্বাভাবিক, তীক্ষ্ণ-নাসা-
ঠেটিজোড়া ঠিক মেয়েদের মত, যেন শিশুর তুলিতে আঁকা। আশ্চর্যের
বিশয়, এমন এক স'গাতসেতে অশ্ব-বিবরে এ মৃদু ক্রমান্বয়। আলোটা উল্কে
দিয়েই, সে আমার মৃদু কুঠার দৃষ্টিতে তাকাল।

‘আজও কি মাতাল হয়ে এসেছে?’

ওর মা তখন বিছানার চিৎপাত হয়ে ফোঁপাচ্ছিল, কখনো বা নাকে
তুলছিল আঙুর।

আমি বললাম, ‘ওর কাপড়-চোপড় ছাড়ান দরকার।’

চোখজোড়া মৃদু নামিয়ে ছেলোট বসল, ‘বেশ তাই করুন।’

আমি যখন স্ট্রীলোকটির ভেজা কাপড় ছাড়াতে ব্যস্ত, ছেলোট ফিস্‌ফিস্
করে যেন প্রতিদিনের অভ্যাসবশে জিজ্ঞেস করল, ‘আলোটা নির্ভয়ে দেব কি?’

‘কেন?’

কোন জবাব দিল না সে। ময়দার বস্তুর মত দেহ থেকে ভেজা কাপড়
ছাড়াবার ফাঁকে ফাঁকে আমি ছেলোটের দিকে নজর রাখছিলাম। সে তখন
জানলার কাছে একটি প্যাকিং-বাক্সের ওপর মৃদু ঘুরিয়ে বসেছিল, পিছনের দিকে
তাকাচ্ছে না। বাক্সটা মোটা কাঠের এবং গায়ে কালো কালো অক্ষরে লেখা—

‘সাবধানে নাড়াচাড়া করিবেন’

এন, আর এন্ড কোং

ছেলোটের কাঁধের সমতলেই জানলাটা। দেয়ালের গায়ে সারি সারি ছোট
তাক। সিগারেট এবং দিগাশলাই-এর খালি বাক্সে ভরা। মনে হল বসার
জায়গার পাশেই হলুদ কাগজে-মোড়া অন্য একটি প্যাকিং-বাক্সকে সে টেবিল
হিসেবে ব্যবহার করে। অসহায় হাতজোড়া দিয়ে গলাটা পেঁচিয়ে ধরে সে
জানালা দিয়ে দূর অন্ধকারের দিকে তাকিয়েছিল।

ইতিমধ্যে ভেজা কাপড়-জামা উন্মোচনের দিকে ছুঁড়ে, দরজার কোণের একটা
মাটির হাঁড়ির জলে হাত ধুয়ে, রুমালে পঁছতে পঁছতে বললাম, ‘বেশ, তবে
চলি!’

আমার দিকে তাকিয়ে সে আধো-বুড়ান স্বরে বলল, 'এবার কি আলো
নেভাতে হবে?'

'তোমার খুশি।'

'চলে যাচ্ছেন? বিস্মিত গলায় অস্থির সার হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলল,
'ওখানে...ওই বিছানায়...শোবেন না মার সঙ্গে?'

রুঢ়ভাবে বললাম, 'কেন?'

সরলভাবে ছেলোট বলল, 'আপনিই জানেন...সকলে শোয় কি না।'

উদ্বেজনায় চারপাশে দৃষ্টি বোলাতে লাগলাম। ডানদিকে কিছু তাকমাংকার।
একটা উদ্‌ন, সামনেই কিছু ময়লা বাসন-পত্ৰ, এককোণে প্যাকিং-বাল্লের
পিছনে, ছেঁড়া কিছু দড়ির টুকরো, একস্থপ ফেসো, কাঠের টুকরো এবং
একটা লাক্সের কাঠ। পায়ের অদরেই পড়ে আছে নাসিকাগজ নরতা একটা
হলধেটে শরীর।

আমি ছেলোটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার পাশে বসতে পারি?'

গোমরা-মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মা কিন্তু ভোরের আগে আর
উঠবে না, শুনেন রাখুন।'

'ছেড়ে দাও। কোন ধরকার নেই তাকে।'

তার প্যাকিং-বাল্লের পাশে বসে, আমি শিশুটিকে বলছিলাম তার মায়ের
সঙ্গে সাক্ষাতের কাহিনীটি। আমার কথাগুলোর মধ্যে ছিল সরস ভঙ্গি।
ছেলোট মাথা দুলিয়ে মৃদু হাসতে হাসতে, ছোট বুকটা চুলকে বলে উঠল,
'ও যে তখন মাতাল।...ভাল অবস্থাতেই কত মজার মজার কাজ করে...ঠিক
ছোট্ট একটা মেয়ের মত।'

'কাঁদায় বসে নোঁকা চালাবার ভঙ্গি, যেন সত্যি সত্যিই সে গান গাইছে
আর হাঁড় বাইছে।'

কাছাকাছি, পরিষ্কার নজরে পড়ল তার দীর্ঘ পল্লবের আরও চোখ-
জোড়া। নীলাভ, বিবর্ণ দেহের জন্য তা আরও উঁচু। উজ্জ্বল কপাল, লালচে
স্বন-কুণ্ঠিত চুলে মাথাটি ঢাকা। তার চোখের চাউনি শান্ত এবং একাগ্র।

গভীরতা ভাষার প্রকাশ করা যায় না। তবুও আমার প্রতি তার একটা অমানবিক দৃষ্টি আমি গায়ে মাখিছিলাম না।

‘তোমার পা-জোড়া অমন কেন?’

ঢাকা-কাঁথাটা হাতড়ে-হাতড়ে কাঠির-মত-সরু একজোড়া পা বের করে, হাতে তুলে প্যাকিং-বাক্সের উপর রাখল।

‘জন্ম থেকেই এ দুটো এরকম। হাটতে জানে না, শুকনো। কোন কাজেই লাগে না আমার।’

‘বাক্সগুলো কিসের জন্য?’

‘ও আমার পতঙ্গশালা—’

কাঠির মত পা-জোড়া তুলে ফের কাঁথায় ঢেকে, বাক্সের নীচে বুলিয়ে রাখল। প্রশ্নটায় সহসা তার মৃদুমন্ডল বস্ফুরের হাসিতে ভরে উঠল।

‘দেখবেন আপনি?...একটু ঠিক হয়ে বসুন। এ জিনিস জীবনে কোথাও দেখেননি।’

সরু, লম্বা হাতজোড়া নিয়ে কৌশলে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে দেয়াল ধরে উঁচু হয়ে হয়ে সে একে একে বাক্সগুলো রাখতে লাগল।

‘সাবধান! খুললেই কিংতু ওগুলো পালাবে। কানের কাছে ধরুন; স্পন্দন শব্দ শুনছেন না?’

‘কি যেন নড়াচড়া করছে—’

‘ঠিক। একটা মাকড়সা। খুব চালাক...ওর নাম ড্রামার।’

স্পন্দন চোখজোড়া চকচক করতেই, মুখে হাসি ফুটে উঠল। দ্রুত দেয়াল-আলমারি থেকে কয়েকটা বাক্স তুলে নিজের কানে পরখ করে আমার কাছে তুলে ধরল। চঞ্চল হয়ে বলল, ‘দেখুন, একটা আরসোলা। ওর নাম এ্যানিসিসম...কি রকম বড়াই দেখুন ওর, ঠিক যেন একটা সৈন্য।...এ বাক্সটা মাছির, গ্রীষ্মতী অফিসাল...অতি বাজে জীব। প্রত্যেকের কাছে দিনরাত গুন্ডুন্ডু করে, এমনকি মায়ের মাথার কাছেও ঘোরে।...এটা মাছি না, নাম মিসাস, রাস্তার ধারে থাকে, দেখতে মাছির মতই।...এটা কালো কাঁচপোকা,

মস্ত বড়। ওর নাম রস, খুব খারাপ নয় এটা।...তবে একটু মাতাল, আর লজ্জা-ধেম্মা বলতে ওর কিছু নেই। খুব মদ-টম খেলে উঠোনে গড়াগড়ি খায়...কেমন লোমে ঢাকা, ঠিক কাল কুস্তার মত।...এটা একটা গুবরে-পোকা...নিকোডিম খুড়ো। এটাকে আমি বাইরে ধরেছিলাম। কেমন ট্যাপা-টোপা, ঠিক যেন একটা সাধু গীর্জা বানাবার পয়সা তুলবার জন্য ঘুরছে। মা ওর নাম দিয়েছে চিপসকেট। খুব পছন্দ করে ওকে। মার অবিশ্যি অনেক পিন্নারের লোক আছে...দিনরাত নাকের কাছে ঘর ঘর করছে...ওই করে নাকাটা তো ক্ষয়েই গেছে।’

‘মা তোমাকে পিটোয়?’

‘মা? কখনই না। আমাকে ছাড়া সে থাকতেই পারে না। ভিতরটা খুব নরম। কেবল একটু মাতাল এই যা! বস্তির সবাই তো মাতাল।...শুঁড়িখানা আর বেশ্যা-লম্পটদের আস্তাবল করে তুলেছে। আমিও মাকে বলি মদ খাওয়া ছাড়ো। দেখবে বড়লোক হয়ে যাবে। আমার কথা শুনবে হাসে। বোকার কাছ থেকে আপনি কি আশা করেন?...কিন্তু ওর মনটা খুব ভাল, ঘুম থেকে উঠলেই বড়োত পারবেন।’

তার ছোট্ট, মধুর আকর্ষণীয় হাসিটুকুতে আমার হৃদয় এমন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল যেন এ শহরের সমস্ত মানুষদের চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে, ‘শোন ধৈর্য ধরে, আমার হৃদয়ের ধর্নি শোন।’ অজানা এক ফুলের মত তার ছোট্ট মাথাটি দুলতে লাগল, চোখজোড়া জীবনীশক্তিতে আরও ভাস্বর—যা আমাকে অজানা বিপুল আকর্ষণে টানতে থাকে।

শিশুসুলভ কিন্তু গভীর অর্থবহ কথাগুলো শুনতে শুনতে স্থান-কাল-পাত্র গেলাম ভুলে। হঠাৎ খেয়াল হল আমার সামনে ছোট্ট জানালা, বাইরে কাদা-লেপা-উনুনের কালো গর্তটা, কোণায় ছড়ান নোংরা বাসনপত্র এবং দরজার একপাশে কাঁধার বিছানায় তেলচিটাচটে হলদে এক তাল মাংসের মত ঘুমন্ত মায়ের দেহটা।

‘সংগ্রহশলাটা স্মরণ না?’—ছেলেটি গর্বের স্বরে জিজ্ঞেস করল।

‘খু—ব ।’

‘অবিশ্যি কোন প্রজ্ঞাপতি জোগাড় করতে পারিনি—একটা মঞ্চও না ।’

‘তোমার নাম ?’

‘ললিতা—’

‘বাস । আমরা খুজন একই নামের ।’

‘সত্যি ? আপনি কি করেন ?’

‘কিছুই না—’

‘বলুন না...প্রত্যেকেরই ত একটা পরিচয় আছে...খুব জানার ইচ্ছে...’

‘খুব ভাল লাগছে আপনাকে ।’

‘হতে পারে—’

‘আমি বুঝতে পারি ।...আপনি একটা দাগী’

‘দাগী ?’

‘হ্যাঁ, তাই ।’

হাসল সে, চোখ পিটপিট করল । যা আমার কাছে অর্থবহ ।

‘কি করে ভাবলে আমি দাগী ?’

‘এতক্ষণ আমার পাশে বসে রইলেন, মানে রাতে বেরোতে আপনি ভয় পান ।’

‘কিন্তু ভোর হয়ে গেল যে ।’

‘তার মানেই, আপনি এখন বেরিয়ে পড়বেন—’

‘আমি আবার আসব তোমার কাছে—’

কথাটা তার বিশ্বাস হল না । চোখ বন্ধ করে খানিক চুপ থেকে বলে উঠল, ‘কেন, কিজন্য আসবেন ?’

‘গল্প করতে ।...খুব সুন্দর ছেলে তুমি...এলে তোমার আপত্তি আছে ?’

‘আসবেন...অনেকেই ত আমাদের ঘরে আসে ।’ ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ‘অবিশ্যি এটা আপনার কথার কথা ।’

‘বিশ্বাস কর, আমি ঠিক আসব ।’

‘বেশ। আমার কাছে আসবেন ভাল। কিন্তু মার ধারে যেতে পারবেন না’

‘কে চায় ওকে?’

‘আপনি আমি হুজ্জন বন্দু।’

‘বেশ।’

‘আপনি বড় বলে খুব অসুবিধে নেই। বয়স কত?’

‘একুশে পা দিলাম—’

‘আমি বারোতে পড়ব। আমার কোন বন্দু নেই, কেবল ঐ ভাঁড়ির মেয়ে কাটকা। আমার কাছে আসে বলে ওর মা ওকে খুব পিটোয়।... আচ্ছা, আপনি কি চোর?’

‘মা। চোর হব কেন?’

‘অমন কুশী মদু আর লম্বা নাক ত চোরদের থাকে।...আমাদের বাড়িতে দুটো চোর আসে। একটার নাম শাসকা, মাথামোটা, ষণ্ডা...আর একটা ভানিসকা—ওর ভিতর কিছু দন্ডামায়া আছে, ঠিক কুস্তার মত। আপনার কাছে খালি বাস্ত আছে?’

‘নিয়ে আসব।’

‘বেশ। আপনার আসার কথা মাকে বলব না—’

‘কেন?’

‘এমনি।...লোক এলেই তো মার ফর্ত। ও লোক ভালবাসে। মামণি আমার এক অদ্ভুত জীব। পনের বছরে ওর পেটে এসেছিলাম। আচ্ছা আপনি কবে আসছেন?’

‘কাল বিকেলে—’

‘বিকলে তো মা মাতাল হয়ে থাকবে? আচ্ছা, চোর না হলে আপনি খেয়ে-পরে আছেন কি করে?’

‘আমি মদু বেচি।’

‘তাই নাকি? আমার জন্য একটা বোতল আনবেন?’

‘না জানার কি আছে ? আজ তবে চলি ?’

‘হান । কাল তবে আসছেন ?’

‘নিশ্চয়ই ।’

সে তার লম্বা হাত দখানা বাড়িয়ে দিতেই আমি পাতলা ঠান্ডা হাড় কগাছা নিজের হাতের মূঠায় মৃদু চাপ দিলাম । আর পিছনে না ফিরে, মাতালের মত উঠানে বেরিয়ে এলাম ।

ভোরের আলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে । জয়াজীর্ণ অট্টালিকার মাথার উপর, আকাশের কোণে তখনও মশু শুকতারাটা দপদপ করছে । কুঠুরির চৌকোনা জানালার গভর্গদুলো নোংরা, মাতালের মত মাটির দেয়াল ফুঁড়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে । ঘরজার সামনেই খাটিয়ার লালমুখো একটা মান্দুশ নিদ্রাচ্ছন্ন । মশু পাজোড়া ছড়ান, মাথাটা ঝোলা, শক্ত বাড়ির-গোছা আকাশমুখী । হাঁ-করা ঠোঁটজোড়ার ভিতর কয়েকটা সাধা দাঁত ; যেন চোখ-বোজা এক নিষ্ঠুর দৈত্য আকাশের দিকে মৃদু করে আছে । একটা কুকুর—পিঠে ঘা—হয়ত কেউ গরম জল টেলে দিয়েছিল, আমার পায়ের কাছে শর্কতে শর্কতে এক সময় ক্ষুধার চীংকার করে উঠল । উষার এ স্নিগ্ধ বাতাসে, আতঁ-ডাক আমার হৃদয়কে করুণ করে তুলল ।

গভরাতের কাছাজলের খানা-খন্দগদুলো এখন শান্ত । সেখানে প্রতিবিশ্বিত হচ্ছে ভোরের এই স্বচ্ছ আকাশ । তার নীল ও বেগুনি রং কাছা-জলের রূপ পালেট এমন এক সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে যা নির্মল, নিষ্ঠুর, আশ্চর্য্যভোলা ।

পরদিন আমার এলাকার ছেলেদের কিছ্ প্রজাপতি এবং কাঁচপোকা ধরে দিতে বললাম । ওষুধের দোকান থেকে কিছ্ বাস্ক জোগাড় করে, একবোতল মধু, কিছ্ রসাল কেক, মিষ্টি নিয়ে লয়ঙ্কার সাথে দেখা করতে গেলাম । উপহার পেয়ে লয়ঙ্কা ভয়ানক বিস্ময় বোধ করল । চোখজোড়া বিস্ফারিত এবং ঘিনের আলোর চাইতেও তা উজ্জ্বল ও সুন্দর ।

‘একি !’—তার গলাটা ঘড়ঘড় করে উঠল । ‘কি এনেছেন ? খুব বড়লোক

নাকি আপনি ? এত বড়লোকের এমন নোংরা পোষাক, তাই বা কেমন করে হবে ? বলছেন আবার চোরও না । ইস্, কি সুন্দর বাস ! হাত পরিষ্কার নেই বলে ধরতে ভয় করছে । ভিতরে কি আছে ? আরে ! কি সুন্দর কাঁচপোকাক ডাক ! তামাটে, সবুজ সব রং এর । কি মজা ! দাঁড়িয়ে কেন, একটু ছুটোছুটি করে নাচুন না ?’

হঠাৎ আনন্দে সে চিংকার দিয়ে উঠল, ‘মামণি ? এসো না ছাই, অপদার্থ । আমার হাত ধুইয়ে দাও । দেখ, লোকটি কত জিনিস এনেছে, ঐ যে তোমাকে যে কাল রাতে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল । ওর নামও লয়কা ।’

‘তোমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত’—পিছন থেকে ধীর, গম্ভীর উত্তর শোনা গেল । সঙ্গে সঙ্গে ছেলটিও দ্রুত মাথা নাড়ল, ‘ধন্যবাদ ! ধন্যবাদ !’

চক্করের ধূলিধূসর অস্পষ্ট দৃষ্টির মধ্যে উনোনের এককোণে মহিলাটির আলুথালু বেশ, ভাস্কর্য্যের মত মুখ । একসারি উজ্জ্বল দাঁতের ফাঁকে মৃদু বিজলির মত হাসি দেখতে পেলাম, যা মন থেকে সহসা মৃদু ফেলা যায় না ।

‘সুপ্রভাত !’

‘সুপ্রভাত ।’ মহিলাটি প্রত্যুত্তর দেয় । গলার স্বর শান্ত, উৎফুল্ল এবং প্রাণোচ্ছল । এক অস্ফুট ভঙ্গিতে চোখটা বাকিয়ে আমার দিকে তাকাল ।

আমাদের কথা ভুলে লয়কা তখন রসাল কেক খেতে খেতে সাবধানে বাসগদুলোতে হাত দিচ্ছিল । তার চোখের নীল আভা পড়ছে গালে । কুঠুরির ময়লা জানলা দিয়ে দেখা দিয়েছে সূর্যের মৃদু, অনেকটা মাঝামাঝি বড়োয় মতো ঝাপসা । ক্ষীণ আলো পড়েছে বালকটির লাল, কুণ্ডিত কেশদ্বায়ে । জামার বোতামটা খোলা, উন্মিলিত দুর্বল হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ আমি এখান থেকে যেন শুনতে পাচ্ছিলাম ।

ওর মা উনুনের পাশ থেকে সরে এসে, ভেজা গামছায় ওর হাতটা মৃদু দিতে এল ।

‘ধর ! ধর ! পালান’—একটা বাস হাতে ছেলেটা তাঁর উত্তেজনায় শরীরটা এলোপাথারি ছুঁড়তে, কাঁথাটা খসে বোয়িয়ে পড়ল চির-পঙ্গু অঙ্গার

পাজোড়া। কাঁথাটা ঠিক করে দিতে দিতে মায়ের মূখের হাসিও বাধা মানল না।

‘ধরুন! ধরুন!’ বলেই নিজেকে কাঁচপোকাটা ধরে হাতের তালুতে নিয়ে গভীর মনোযোগে বিচিত্র রংগুলো দেখে, অতি পরিচিতির মত বলল, ‘এগুলো আমাদের অনেক আছে—’

‘টিপো না...টিপো না’, ছেলেরিট হাঁহি হাঁহি করে উঠল। ‘জানো, মাতাল অবস্থায় একদিন সবকটা পোকা আমার টিপে মেরে ফেলেছিল।’

‘হিঃ, বলে না সোনা’—মহিলাটি একটু লজ্জা পায় ‘মাতাল’ কথাটা শুনলে। ‘মরা পোকাগুলো সব আমি পড়ে ফেলেছি—’

মা এবার প্রতিবাদ করে বলল, ‘কিন্তু তোমায় আমি অনেক জোগাড় করে দিইনি পরে?’

‘কোন কাজে লাগেনি। তুমি যেগুলো নষ্ট করেছিলে, সেগুলো পড়ুনো, কথা শুনত, চালাকি করত না। তাই মরে গেলে, আমি হেঁচড়ে হেঁচড়ে গিয়ে উনুনের মধ্যে গর্জে দিয়েছি। ওখানে আমার একটা কবর বানানো আছে। জানেন, মিন্কা নামে একটা মাকড়সা ছিল, ঠিক মায়ের এক নাগরের মত—সেইসে মা, ফর্তি বাজ বড়োটা এখন জেলের ঘানি টানছে...।’

ময়লা হাতে ছেলেরিটর মাথার হাত বোলাতে বোলাতে মা মৃদু হেসে বলল, ‘আমার দৃষ্টু খোকন!’ মৃদু কন্ডয়ের ঠেলা দিয়ে আমার বলল,—‘সত্যিই আমার প্রাণের ধন। এমন সুন্দর চোখ।’

ছেলেরিট তখন বর্কে একটা পোকায় প্রতি গভীর মনোযোগ দিয়ে বলল, ‘কেনতো একটা চোখ নিয়ে পাজোড়া ফিরিয়ে দাও।’ আপন মনে পোকাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, ‘ইস্ শরীরটা লোহার মত। কি রকম মোটা।...ঠিক সেই সাধুটার মত, মনে আছে মা, যাকে তুমি দড়ির মই বানিয়ে দিয়েছিলে?’

‘খু-ব মনে আছে’—আমি তাকাতেই হেসে বলল, ‘একদিন হঠাৎ এক সাধু এসে হাজির...জু-বু-বু, মন্ত চেহারা। আমাকে দেখেই বলল, ‘ভুইতো

কে'সো-বাড়ি কুড়োস, আমাকে একটা বাড়ির মই বানিয়ে দিবি ?' 'জীবনে আমি ও মই দেখিনি, জানি না', বলতেই আলখাল্লা খুলে, পেট-জড়ান শব্দ একগাছা বাড়ি বার করে শিখিয়ে দিল কারবা-কানুন। অগত্যা বুনে দিতে হল, কিন্তু কি কাজে লাগে ও বস্তু ?...হয়ত গীর্জা থেকে চুরিচুরি করবে।" মৃদু হেসে পুনরায় সন্তানের গলা জড়িয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'সবজান্টা সোনা আমার। শেষে হল কি জানেন, লোকটা ঠিক চিনে হাজির। আমি বললাম, যদি চুরির মতলবে এটা বানিয়ে থাকেন, আমি দেব না। কথাটা শুনলে সে একচোট খুঁতের হাসি হাসল।'

'না, না, এটা দেয়ালে গুঁথবার জন্য।...আমরা যেখানে থাকি সেখানে মস্ত এক দেয়াল। আমরা পাপী, পাপগুলো থাকে দেয়ালের ওপাশে। ভেবো না কিছ, দিয়ে দাও।' রাজি হতেই, লোকটা রাত কাটাতে চাইল। খুব হাসাহাসি হয়েছিল দুজনার।'

'তুমি ত কেবল হাসাহাসি ভালবাস, খোজও তাই'—ভারি গলায় ছেলোট বলল। 'সামোভারে কি চাপাবে ?'

'চাপাব কি ? একদানা চিনি নেই ঘরে—'

'কিনে আন।'

'পরসা ?'

'মদ খেয়েই গোল্লায় গেলে। ও'র কাছ থেকে নাও।'—আমার দিকে ফিরে বলল, 'আপনার কাছে পরসা-কড়ি কিছ আছে ?'

আমি মার হাতে টাকা দিলাম। সে একলাফে নোংরা, ভোবড়ান সামোভারটা উনুন থেকে নামিয়ে রেখে খুঁশিতে গদন গদন করতে করতে বেরিয়ে গেল। ছেলোট পিছ দাক দিল, 'মা, এই জানলাগুলো একটু পরিষ্কার করো, আমি কিছ দেখতে পাই না।'

স্যাঁতসেতে দেয়ালের গায়ে গজাল পুতে পাতলা কাঠের তাক বানান হয়েছে। পোকাগুলো সরিয়ে, সাবধানে বাস সাজাতে সাজাতে ঘায়ের সামনেই বলল, 'মুদুরগীর মত চতুর...বা বললাম আপনাকে। তবে ওর জীবনটাও

শব্দ কণ্ঠের। যেখানে ফেসো-বড়ি কুড়োর, আপনার দম বন্ধ হয়ে যাবে।
 ...ধুলোর ভরা। মাঝে মাঝে আমি চেঁচাই : মা আমার বাইরে নিয়ে চল,
 ভগনানের দোহাই, আমার দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মা বলে, ধৈর্য ধর
 বাছা, তুই ছাড়া আমার কে আছে? সত্যিই সে আমাকে শব্দ ভালবাসে।
 সারাদিন ঘরে শব্দ তার কাজ হল আপন মনে গান।...প্রায় হাজারটা গান
 জানে।’

মৃদুমন্দল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, চোখজোড়া জ্বলতে লাগল, সরু ভুরু-
 জোড়া বাকিয়ে উচগলায় নিজেই গাইতে লাগল—‘নরম গদির পরে শব্দে
 থাকে সোমিয়া।’

শব্দে বললাম, ‘গানটা ভাল না।’

লয়কাও সায় দিয়ে বলল, ‘হ্যাঁ, এগুলো এরকমই।’—হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল,
 ‘ঐ যে, গান বাজছে! জলদি করে একটু জানলার কাছে নিয়ে চলুন না!’

আমি তার অস্থিচর্মসার হালকা দেহটা তুলে ধরতেই, উৎসাহে জানলা
 দিয়ে মৃদুটা গলিয়ে দেয়াল আঁকড়ে রইল, নীচে পদ্ম পাজোড়া শব্দকনো
 ভাঙ্গা ডালের মত ঝুলে আছে। বাইরে পথ দিয়ে, হারমোনিয়াম বাজিয়ে
 একটি বালক মিঠে গলায় গেয়ে চলছিল। নাছোড়বান্দা একটা কুকুর
 চেঁচাচ্ছিল অনর্গল। তালে তাল মিলিয়ে লয়কা এই অশ্ব কুঠুরির মধ্যে
 মৃদু গলায় গুন গুন করছিল।

ইতিমধ্যে চব্বরের ধূলি-জাল সরিয়ে রোদ আরও উজ্জ্বল হচ্ছে। মায়ের
 বিছানার ঠিক ওপাশে, ধূসর দেয়ালে একটা সস্তা ঘড়ির ধাতব পেন্ডুলামটা
 ঘষা-পরসার মত দুলেই যাচ্ছিল। উনোনের বাসনপত্রর ধোয়া নয়,—পদ্রু
 ধুলোর আন্তরণ। ঘরের কোণে কোণে জেগে আছে মাকড়সার বাসা আর
 ঝুল। লয়কার বাসস্থান হল ঠিক ধূলিমলিন একটা গৃহ। এ গৃহহার
 প্রতিটি বগিঁড়ি যেন নোংরা, অসহনীয়, বীভৎস এক দৃষ্টি মেলে বেহারার
 মত সবার দিকে তাকায়।

সামোভারে জল ফোটার শব্দ জাগছে, রাস্তায় হারমোনিয়াম থেমে যেতেই

কতকগুলো ককশ কণ্ঠ গজ্জের উঠল, ‘দূর হ’ আপদ ।’

দীর্ঘশ্বাস ফেলে লয়কা বলল, ‘নামিয়ে বিন...লোকগুলো ওকে ভাঙিয়ে দিল ।’ আমি আবার ওকে প্যাকিং-বাক্সের ওপর বসিয়ে দিলাম । কাশির সঙ্গে বৃক ডলতে ডলতে মৃদুচটা ব্যথায় কুকড়ে যাচ্ছিল ।

‘বৃকটা ব্যথা করে । বেশিক্ষণ বাইরের আলো-বাতাস আমার সহ্য হয় না । বলছিলাম, আপনি কি প্রেতাত্মা দেখেছেন কখন ।’

‘না—’

‘আমিও না।...আমি গভীর রাতে উদ্‌নের নীচে তাকাই, কখনো বেরিয়ে আসে কি না । কিছু দেখি না । ওরা কবরস্থানে ঘোরে, তাই না ?’

‘তাদের দ্বিগুণে কি দরকার ?’

‘খুব মজা । আচ্ছা দু’একটা প্রেতাত্মা যদি দয়ালু হয় ? ভাড়ির মেয়ে কাটকা একদিন কুঠুরির মধ্যে প্রেতাত্মা দেখেছিল...তার তো দমবন্ধ হবার জোগাড়...কিন্তু আমি কোন জিনিসেই ভয় পাই না ।’

পাজোড়া কাঁথার মধ্যে ঢুকিয়ে, সে এক নাগারে বলেই চলল, ‘আমি ভয়ঙ্কর জিনিস পছন্দ করি...ভয়ঙ্কর স্বপ্ন আমার প্রিয়...আমি দেখিও । একবার স্বপ্ন দেখেছিলাম একটা গাছ উল্টে গিয়ে শিকড়গুলো বড় হতে হতে আকাশে ছড়িয়ে গেল, আর পাতাগুলো সব মাটির মধ্যে । সমস্ত শরীর ঘেমে গেছিল, ঘুম ভেঙ্গে যেতেই কেমন শক্ত হয়ে গেছিলাম ।...একবার স্বপ্নে দেখেছিলাম মা’কে । উলঙ্গ হয়ে পড়ে আছে—একটা কুকুর তার পাকস্থলীটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে । এক একটা টুকরো খুবলে নিচ্ছে আর ফেলে দিচ্ছে থু থু করে ।...খুবলাচ্ছে আর ফেলছে...’ একবার দেখেছিলাম আমাদের বাড়িটা কিছুক্ষণ কেঁপেই রাস্তা দিয়ে গাড়িয়ে চলেছে । দরজা-জানলাগুলো বেজে উঠছে দূরদূর-দূরদূর । অফিসার-গিন্নীর বিড়ালটা ছুটছে এর পেছন পেছন ।’

সবু ঘাড়টা অম্ভুতভাবে ঝাঁকানি দিয়ে, হাতে মিস্ট তুলে নিল । রাস্তা একটা কাগজের ভাঁজ খুলে সামনে টানটান করে রাখল জানলার উপর ।

‘কাগজ থেকে আমি অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস বানাব। অথবা কাটকাকেও দ্বিগুণ দিতে পারি।...ও সুন্দর জিনিস ভালবাসে। ভালাকাচ, কাগজ, খাপটাপ, অনেক জিনিস। আমি তো বলি, তুমি যদি একটা গুড়ো পোকাকে রীতিমত খাইয়ে যেতে পারিস, একদিন ওটা ঘোড়া হয়ে উঠবেই, তাই না?’

বুদ্ধলাম, নিজেকে সে এ ধারণা পোষণ করে, সুতরাং জবাব দিলাম, ‘ভালভাবে খাওয়াতে পারলে, হবে না কেন?’

‘হাঃ, সত্যি?’—অধীর আত্মহারা হয়ে বলল, ‘কিন্তু মা আমার একথা-গুলোতে কেবল রাগে কেন?’

সে একটা কটু মন্তব্য করল।

‘মা একটা আশ্রয় গাড়ো! একটা বিড়ালকে ভালভাবে খাইয়ে জলদি ঘোড়া করা যায়, তাই না?’

‘ঠিক—’

‘আমার কপালটাই খারাপ, পেটপুড়ে খাওয়া জোটে না! পেলো কি মজা হত!’

ভয়ানক উদ্বেজনায়, বুদ্ধটা চেপে ধরল।

‘মাছি কুকুরের মত আকার নিয়ে ঘুরছে। গুবরে পোকারা ঘোড়ার মত শক্ত-সবল হলে ত ইটের বোঝা টানান যেতে পারে, তাই না?’

‘মুশকিল হল ওদের যে শব্দ আছে—’

‘অসুবিধে নেই, শব্দে আপনি লাগাম পরিয়ে দিতে পারেন।...আচ্ছা, একটা মাকড়সাই ধরুন না কেন—বিশাল...কার মত হবে? যদিও বিড়াল-ছানার চাইতে বেশি বড় আমি মনে করতে পারি না, যতই ভয়ের ব্যাপার হোক মাকড়সা জীবটি। শুধু যদি আমার হাটার ক্ষমতা থাকত, ওদের দেখিয়ে দিতাম কি দিয়ে কি করতে হয়।’

‘দিনরাত পরিভ্রম করে এই সংগ্রহশালাটার পেট ভরাতাম; দোকান দিয়ে পরসী কামিয়ে মার জন্য খোলামেলা আলোবাতাসে একটা বাড়ি বানিয়ে

দিতাম...আপনি কোনদিন খোলা মাঠে থাকার স্বপ্ন দেখেছেন ?

‘স্বপ্ন দেখা পাবনা কেন—’

‘কেমন অনুভূতি হয় বলুন তো ?’

আমি তাকে খোলা মাঠ এবং প্রান্তরের গম্প শোনালে, সে নীরবে মনোবোণ দিয়ে শুনে গেল। ভারী হয়ে এল চোখের পাতা, মৃদুগন্ধের ঝিৎঝিৎ বিস্ফারিত—যেন গম্পের আবেশে ঘুমিয়ে পড়তে চায়। এই অবস্থায় আমি আস্তে আস্তে কথা বললেও ফুটন্ত সামোভারটা নিয়ে মা হাজির। হাতে ঠোঙ্গা, জামার পকেট থেকে উঁকি দিচ্ছে ভদ্রকার বোতল।

‘আমুন—’

বিস্ফারিত চোখে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছেলেরিট বলল, ‘আপনি সর্বকিছু সরিয়ে দিতে পারেন ? কেবল থাকবে ফুল আর সবুজ ঘাস। মা, তুমি কি একটা ঠালায় করেও খোলা মাঠের মধ্যে নিয়ে যেতে পার না আমার ? হায়, ওগুলো না দেখেই হয়ত আমার বিদায় নিতে হবে। তুমি এমনই নিষ্ঠুর, শশু।’ গলার স্বর তার বিষন্ন হয়ে উঠল। মা মৃদু গলায় বলল, ‘ছিঃ নোংরা কথা বলে না, তুমি এখন ছোট না ?’

‘হ্যাঁ, তোমার মূখেই তো নোংরা কথা না বলার উপদেশ মানায়। কুকুরের মত তুমি যেখানে খুশি লাফ। যাক, ভাগাটা তোমার নেহাৎ ভাল,’ হঠাৎ আমাকে বলল, ‘এই মাঠ, প্রান্তর কি ভগবানের সৃষ্টি ?’

‘মনে হয়—’

‘কি তার উদ্দেশ্য ?’

‘মানুষের পায়ে হাঁটার জন্য।’

ছেলেরিট হেসে বলল, ‘উদ্ভূত প্রান্তর, আঃ ! আমি সেখানে সংগ্রহশালাটা নিয়ে প্রত্যেকের মনুস্তি দিতাম। তারা সুখে থাকত ! এই বন্যজীবন থেকে বেরিয়ে আপন মনে ঘুরে বেড়াত। এরাই ত ভগবান সৃষ্টি করেছে, তাই না ?’

কথাটা শুনে স্ত্রীলোকটি চীৎকার দিয়েই হাসিতে সারা শরীর কাঁপিয়ে তুলল। ধপাস করে বিছানায় গাড়িয়ে ছুঁড়তে লাগল হাত-পা।

‘কে আচ্ছ আমার তুলে ধর। আমার সোনামণি।’

লগ্নকা একবার তাকিয়ে হেসে একটা অল্পল মস্তব্য করল।

‘একেবারে ছেলেমানুষ। পেটে খিল খরল বলে! দিনরাত হাসতে ভালবাসে।’ অল্পল মস্তব্যের পুনরাবৃত্তি করতেই বললাম, ‘হাসতে যাও! বিরক্ত হচ্ছে কেন?’

‘বিরক্ত হইনি। আমার রাগ হয় যখন নোংরা জানলাটা পরিষ্কার করে না। পায়ে ধরি, বলি, মা ওটা পরিষ্কার কর, এমন রোদ, আলো আমার কপালে জোটে না, তবুও সে ভুলে যায়।’

কাপ-ডিসগুলো ধুতে ধুতে মর্চকি হেসে শ্রীলোকটি আমার দিকে নীল-চোখের দৃষ্টি দিল। ‘একটি রক্ত না? দিনরাত ওকে আশীর্বাদ করি...● যদি না থাকত, কবে যে আমি গলায় দাঁড় দিয়ে বা ডুবে মরতাম!’

লগ্নকা বলে উঠল, ‘আপনি কি গবেট?’

‘মনে তো হয় না। কেন?’

‘মা বলে আপনি একমিট গবেট।’

‘বুঝলাম। কিন্তু কি কারণ?’

শ্রীলোকটি নিবেদন করেও ছেলের জবাব বন্ধ করতে পারল না।

‘রাতে আপনি রাস্তা থেকে একটা মাতাল মেয়েছেলেকে ঘরে আনার সুযোগ পেয়ে, বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চলে গেলেন, ব্যাস! আমি অবিশ্যি এতে রাগ করছি না। ভারিছি, কেমন বৃদ্ধি করে মার গোপন ব্যাপারটা আমাকে ফাঁস করে দিলেন।’ মহিলাটির কথা বলার ভঙ্গিও বালিকার মত। চোখ-জোড়াও নিষ্পাপ, কেবল কুৎসিত হল ক্ষয়ে-যাওয়া নাক, ক্ষতবৃদ্ধ ঠোঁটের জন্য বেরিয়ে-আসা দাঁতের পাটি। আর কিছটা খারাপ হাঁটা-চলার ভঙ্গি, ভাঁড়ামি, আর অমার্জিত কিছু কথাবার্তা।

উৎসাহে বলল, ‘আম্নন একটু চা খাওয়া যাক।’

লগ্নকার পাশের বাস্কাটার পর সামোভার। ঢাকনা ঠেলে বন্দী বাষ্প বেরিয়ে আসবার চেষ্টা চালাচ্ছে। সামোভারের মূখে হাত দিতেই তালু গরম ভাপে ভিজতেই মাথায় পড়ছে ফেলে ছেলেটি। যেন একটা খেলা, চোখে মূখে তার স্বপ্নাল দৃষ্টি।

‘আমি ঝড় হলেই, মায়ের তৈরী ঠেলাগাড়িতে চড়ে পথে পথে হামাগুড়ি

বিয়ে ভিক্ষে চাইব। অনেক পরস্য জমলে হামাগর্দীড় ঢালাব খোলা মঠে।’

হাসির সঙ্গে স্বীকৃতিস্বরূপ বেরোতেই মা বলে, ‘হার কপাল! ও ভাবে খোলামঠ বৃদ্ধি স্বর্গ। ওখানে সব ছাউনি পাতা, আছে কেবল বেহারা ফোজ আর মাতালগুলো।’ লয়কা প্রতিবাদ জানায়, ‘মোটেই না। জিজ্ঞাস কর ঠেকে, কি রকম দেখতে—উনি নিজের চক্ষু দেখেছেন।’

‘আমিও দেখছি—’

‘নিশ্চয়ই মাতাল হয়েছিলে।’

শিশুর মত বৃদ্ধনে তর্ক জুড়ে দেয়। উত্তেজক, এলোপাখাড়ি। ইতিমধ্যে শ্রীশ্রম বিকেল গড়িয়ে যায়। রক্তবর্ণ সূর্যের পাশে জমতে থাকে বৃন্দ নীলাভ মেঘ। উঠানে অশ্রুকার হামাগর্দীড় দেয়।

ছেলেটি পুরো একমগ ঢা খেয়ে একটু ঘামতে শুরু করল।

‘পেট ভরে গেছে, ঘুমও আসছে বৃ চোখ ভেঙ্গে—’

মা বলল, ‘ঘুমিয়ে পড় তা’লে—’

‘উনি তো এই ফাঁকে চলে যাবেন...তুমিও কি বেরোচ্ছ?’

‘ভাবছ কেন, ঠেকে যেতে দিচ্ছি না’—বলেই মহিলাটি আমার হুটু বিয়ে পদতো দিল।

‘যাবেন না কিন্তু’—বলেই লয়কা চোখ বৃদ্ধে, শরীরটা ছাড়িয়ে, টুপ করে প্যাকিং-বাক্সের মধ্যে ঢুকে পড়ল। হঠাৎ মাথাটা তুলে মাকে ভৎসনা করে উঠল, ‘যারা তোমাকে শৃঙ্গ পিটোয়—সেই রাম-শ্যাম-যদু-মধুর সঙ্গে চলারি না করে অন্য দশটা মেয়েমানুষের মত ঠেকে বিয়ে করে ঘর করতে পার না? ...উনি মানদুষ্টা খুবই দয়ালু...।’

‘ঘুমিয়ে পড়’—শান্ত গলায় কথাটা বলেই, নীরবে চোখজোড়া নীচু করে চায়ের কাপে মনোযোগ দিল।

‘তাছাড়া ওনার পয়সাকড়িও আছে।’

কিছুটা সময়ের জন্য মহিলাটি নির্বাক বীভৎস ঠোঁটজোড়া বিয়ে কেবলই কাপে চুমুক দিয়ে চলেছে। হঠাৎ খুব পরিচিতের মত বলে উঠল, ‘এই আমাদের জীবনের ধারা...রাস্তা, একঘেরে। ও আর আমি, আমি আর ও, আর কেউ নেই। পথে আমাকে সবাই ভৎসনা করে, ডাক্তার খানিক। কি

আসে বল ? আমার তো কিছুতেই লজ্জা পাওয়ার নেই। সত্যিই তো, পৃথিবীর চোখে আমি তো অজ্ঞান, আপনি নিজের চোখে দেখলেন। যে কেউ চোখ বুলোলেই বুঝতে পারবে। হ্যাঁ, সোনামণি আমার হৃদয়ে পড়েছে। আমার এ ছেলেরিট বড় ভাল।’

‘সত্যিই ভাল—’

‘আমি ওর দিকে নজর দেয়ার সুযোগ পাই না। খুব হৃদয় রাখে তাই না?’

‘খুবই হৃদয়মান—’

‘আপনিই প্রথম বললেন। ওর বাবাও ছিল ভদ্র...বরষক। কাজ করত একটা অফিসে কি যেন নাম, আহাঃ ভুলে যাচ্ছি, কি বলেন আপনারা? বেখানে কাগজপত্র লেখা হয়?’

‘দলিল ঘর?’

‘হ্যাঁ, খুবই ভদ্র, দয়ালু ছিলেন। আমাকে বড় ভালবাসতেন। আমি তার বাড়ি কি-এর কাজ করতাম।’

উঠে গিয়ে, খোলা পাখিটো কাঁধায় ঢেকে দিল। টুকটাকি দ্বিগ্নে বালিশ বানিয়ে মাথাটা কাৎ করিয়ে, পুনরায় শূন্য করল।

‘হঠাৎ একদিন উনি মারা গেলেন! ব্যাপারটা হয়েছিল রাতে, আমি তখন কাজ সেরে চলে এসেছি। ধাম্ করে মেঝের পড়ে গেলেন, পর মৃহুতেই মৃত্যু। আপনি তো ব্যবসা করেন, মর্দ বেচেন?’

‘হ্যাঁ—’

‘নিজের—?’

‘না, মালিক আছে।’

সে আরও ঘন হয়ে এল।

‘আমার ব্যাপারে ঝঁতঝঁত করার প্রয়োজন নেই, মশাই। আমার মধ্যে সক্রমক কিছু নেই, আপনি রাস্তার লোকদের জিজ্ঞেস করতে পারেন।’

‘আমি ঝঁতঝঁতে নই।’

সে তার কয়ে-বাওয়া নখ, কর্কশ আঙ্গুলের ছোট হাতখানা আমার হাঁটুর ওপর আঙ্গুলি রেখে মনের উত্তাপে বলতে লাগল, ‘লক্ষ্যের জন্য আমি

আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ ।...আজকের তারিখটা ওর কাছে এক অরণীর উপভোগ্য দিন । আপনি আজ দারুণ উপকার করেছেন আমার ।’

‘আমি উঠব’—বলতেই সে বিস্ময়ে বলল, ‘কোথার ?’

‘কাজ আছে—’

‘থেকে বান—’

‘উপায় নেই’, সে একবার পুত্রের দিকে, আবার ক্রমাগত জানালা, আকাশের দিকে তাকিয়ে শাস্তস্বরে বলল, ‘ধাকতে চাইছেন না কেন ?...আমি যদি আমার এ মদ্য রুমাল দিয়ে ঢেকে রাখি ? পুত্রের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছে করছে । যদি বলেন তো আমি আমার শরীরটাও ঢেকে রাখব ?’ হঠাৎ এক গভীর উত্তাপ ও অনদ্ভূতির সুরে সে কথাগুলো বলল । ভান্সাচোরা মদ্যে, শিশুর সারল্যে-ভরা চোখজোড়া ঝলমল করে উঠল । সে হাসিতে কোন দৈন্য নেই, বরং আছে এমন আশ্চর্য-সমৃদ্ধির ছাপ যা নাকি কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধে সক্ষম ।

‘মা !’—ঘুমের মধ্যে জেগে উঠে ছেলের চীৎকার ছিল, ‘হামাগুড়ি দিচ্ছে ! তাড়াতাড়ি মা ।’ ছেলের দিকে ঝুঁকি বলল, ‘স্বপ্ন দেখছে ।’

আমি উঠোনে নেমে এসে খানিক আচ্ছন্ন হয়ে রইলাম । কুঠিরর খোলা জানালা থেকে উচ্চস্বরে গান ভেসে আসছে । ঘুমপাড়ানি গান । অদ্ভুত কলির স্বপ্নালঙ্কারের গান কানে ভেসে এল ।

‘ফিরে এল জীবনের জীর্ণতা

পিছদ পিছদ দঃখ ও দৈন্য

সংখ্যার তারা নয় মোটেই নগণ্য

কে’দে কে’দে কলজেরটা হয়ে গেল শূন্য

আমি যে অভাগী

আমি যে অভাগী

কোথা ছুটে গেলে পাব এক ফোঁটা শান্তি ।’

আমি ধাঁতে ধাঁতে ঘসতে ঘসতে দ্রুত উঠোন পেরিয়ে গেলাম ।

মানুষের জন্ম

সেটা ছিল '৯২ সালের বার্ষিকের বছর। কোডর নদীর তীরে, সমুদ্র থেকে সামান্য দূরে, সুন্দর ও ওকেশ্যচরীর মধ্যবর্তী একটি স্থান। চকচকে পাহাড়ী স্রোতের কলতান ছাপিয়ে সমুদ্রের ডেউগুলো তীরে আছড়ে পড়ছে ও তার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

শরৎকাল। চেরীগাছের হলুদ পাতাগুলো কোডর নদীর সাধা ফেনার মধ্যে ভৎপর রুই মাছের মত পাক খাচ্ছে, ছুটে বেড়াচ্ছে। আমি নদীর ধারে, পাথরগুলোর ওপরে বসে আছি, আর চিন্তা করছি, গাল ও করমোরেট পাখীরাও সম্ভবতঃ পাতাগুলোকে মাছ বলে ভুল করছে এবং হতাশ হয়ে উঠছে। আর সেই কারণেই তারা আমার ডানদিকে, গাছগুলো থেকে কিছু দূরে যেখানে সমুদ্র এসে তীরে আছড়ে পড়ছে, এমন আহত স্বরে চিৎকার করে উড়ে বেড়াচ্ছে।

মাথার উপরে চেষ্টনাট গাছগুলো সোনার মত চকচক করছে। আর পারের কাছে অসংখ্য পাতা পড়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন মানুষের বিচ্ছিন্ন-হাতের-পাতা ছড়িয়ে আছে। নদীর অপর পারে হর্নবিম গাছের শাখাগুলোর পাতা ইতিমধ্যেই খসে পড়ে গেছে—শাখাগুলো ছেঁড়া জালের মত ঝুলে রয়েছে। তার মধ্যে একটি লাল-হলুদ পাহাড়ী কাঠঠোকরা লাবিরে লাবিরে এক ডাল থেকে আর এক ডালে তার কালো ঠোঁট দিয়ে পোকাকর খোঁজে গাছের ছাল ঠোকরাচ্ছে। সুন্দর উত্তর থেকে আগত অতিথিরা—ছোটতে ছোট টেমিটটস ও ধূসর নুখাচেস পাখীরা সেসব পোকা আগেই খেয়ে গেছে।

আমার বাঁদিকে, পাহাড়ের চূড়া ঘেঁসে, কালো ধোঁয়ার মত মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে—হয়ত বা বৃষ্টি হবে। পাহাড়ের সবুজ ঢালু জমির উপরে সেই মেঘের ছায়া এসে পড়েছে। সেই ঢালু জমিতে শুকনো ধলুউ গাছ জন্মায়, আর সেখানে পুরোণো বাঁচ ও বাতাবিলেবু গাছের কোটরে কন্য-মধু পাওয়া যায়। রোমের রাজত্বকালে সেই মধু মহান পম্পেই-এর সৈন্যবাহিনীর

বর্নাশ ঘটিয়েছিল প্রায়—একটা পুরো বাহিনী সেই মধুর মাতালি-করা মিস্ট্রে মাটিতে ঢলে পড়েছিল। লরেল ও এঞ্জেলিয়া গাছের ফুল থেকে মোমাছির এই মধু সংগ্রহ করে। আর পাখিকেরা গাছের কোটর থেকে এই মধু সংগ্রহ করে পাতলা ময়দার কেক, লাভাশ-এর উপর ছাড়িয়ে খায়।

চেস্টনাট গাছের নীচে, পাখরের উপরে বসে, আমিও ঠিক তা-ই করছি ও একটা রুদ্র মোমাছির হুলের বংশনছানে হাত বোলাচ্ছি। একটা চায়ের পাত্রে-ভরা মধুর মধ্যে রুটি ভুবিয়ে থাকি, আর শরতের অবসন্ন সূর্যের মধির আলস্যভরা লীলা উপভোগ করছি।

শরৎকালের ককেসাস পর্বত দেখতে অনেকটা মহান জ্ঞানী-ব্যক্তির তৈরী বৈভবপূর্ণ ক্যাথিড্রালের ভেতরকার দৃশ্যের মত। সেই জ্ঞানী-ব্যক্তির আবার বড় বড় পাপীও বটে। বিবেকবৃদ্ধির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে তাদের অতীতকে আড়াল করার জন্যই এই ক্যাথিড্রাল তৈরী করা হয়েছিল। নীলমণি ও পান্না-খচিত একটি বিশাল স্বর্ণমন্দির। পাহাড়ের দিকটা সিন্ধু-তৈরী মস্নতম কার্পেটে মোড়া—এই কার্পেট তুকারী বানিয়েছে, বানান হয়েছে সমরখন্দ ও শেমাহাতে। তারা সারা বিশ্ব লুণ্ঠন করে সম্পদ এনে এখানে সূর্যের মদুখোমুখি এই মন্দির বানিয়ে যেন বলতে চাইছে : “তোমার—তোমা থেকেই—তোমাকেই !”

আমি দেখতে পাচ্ছি লম্বা লম্বা দাঁড়িওয়ালা পুরুষেরা, হাস্যোজ্জ্বল শিশুর মত বড় বড় চোখ নিয়ে পাহাড় দিয়ে নেমে আসছে। মৃত হস্তে তারা রং-বেরং-এর সম্পদ ছড়াতে ছড়াতে, সমতলভূমিকে সুসজ্জিত করছে। দেখতে পাচ্ছি তারা রূপার পুর, আন্তরণ পাহাড়ের চূড়াগুলোকে ঢেকে দিচ্ছে এবং সমস্ত অঞ্চলগুলো মেনিফোল্ড গাছের প্রাণবন্ত কাপড় দিয়ে ছেয়ে দিচ্ছে। আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের হাতের ছোঁয়ায় শব্দীয় সুসমা ভরা এই জমিটা অবর্ণনীয় সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

কি চমৎকার একটি আমন্ত্রণ—এই পৃথিবীতে মানুষের আমন্ত্রণ ! বিশ্বকর বস্তু কি অদৃষ্ট সম্পদই দেখা যায় ! সৌন্দর্যের নীরব আনন্দ কি তীব্র মিশ্রি হয়ে মানুষের হৃদয়ে আলোড়ন আনে !

সীতা কথা বলতে কি, মাঝে মাঝে আপনাতত্ত্ব দাবী লাগে। জলন্ত

যুগ্ম আপনার বুকটা ভরে রাখে এবং ক্রোধ লোভাতুরভাবে আপনার হৃদয়ের
 রক্ত চুষে নেয়, কিন্তু তা চিরকাল ধরে ঘটতে পারেনা। এমনকি প্রাঙ্গণই
 সুবর্ণ ও অত্যন্ত করুণভাবে মানুষের প্রতি যুগ্মা বর্ষণ করে ; সে তাদের জন্য
 কত কষ্টই না করেছে, অথচ তারা কি জন্মনা হয়ে উঠেছে...।

স্বাভাবিকভাবেই, বেশ কয়েকজন ভাল মানুষও আছে, কিন্তু তাদের
 কিছু সংশোধন করতে হবে, অথবা বরং তাদেরকে নতুন করে গড়ে তুলতে
 হবে।

আমার বান্ধবের ষোপের উপর দ্বিগুণ মানুষের কালো কালো
 মাথা দেখতে পাচ্ছি—মাথাগুলো ঝুঁকে ঝুঁকে চলছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের
 মৃদু গর্জন ও নদীর কলতানের মধ্যে মানুষের কঠোর মৃদুভাবে শোনা
 যায়। এ কঠোর “দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের”। এরা সুখদমে একটা রাস্তা
 বানাজ্জিল, আর এখন চলছে ওকমচিগ্রীর পথে—যদি সেখানে কোন কাজ
 পায়, এই আশায়।

আমি ওদের জানি—ওরা ওরেল থেকে আসছে। আমি ওদের সাথে
 কাজ করেছিলাম এবং পরশুদিন আমাদের সকলকে একসাথে ছাটাই করে
 দেওয়া হয়েছে। আমি ওদের আগেই যাত্রা করেছি—রাগিবেলা, যাতে সময়-
 মত সমুদ্রতীরে এসে সুবোধন দেখতে পারি।

ওরা ছিল সংখ্যায় পাঁচজন—চারজন কৃষক ও একজন চোয়াল-বার-করা
 বদ্বতী কৃষক-রমণী, সে পোয়াতী ; তার বিরাট পেটটা উঁচু হয়ে ওপরের
 দিকে ওঠা। আর তার নীল-ধূসর চোখে ছিল ভয়ের দৃষ্টি। আমি দেখতে
 পাচ্ছি তার হলুদ-স্কাফে-ঢাকা মাথাটা সুবর্ণমুখী ফুলের মত বাতাসে
 ষোপের উপরে দুলছে। সুখদমে ওর স্বামী মারা গেছে। আমি এদের সাথে
 একই ঝুপকিতে বাস করতাম ; চিরচিরিত রুশী প্রথায় তারা তাদের দুর্ভাগ্যের
 কথা এত বেশী করে জোরে দ্বিগুণ বলত যে তাদের হা-হুতাশ তিনি মাইল দূর
 থেকেও শোনা যেত।

দুর্ভাগ্যের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে এই লোকগুলো এখন নিঃপ্রাণ হয়ে
 গেছে। দুর্ভাগ্য তাদের দেশের জীবন, উপবাসী মাটি থেকে ছিন্নমূল উৎসাদ
 করে দ্বিগুণ শরীরের পাতার মত ঝেঁটেরে এখানে নিয়ে এসেছে। এখানকার

এই অসুস্থ, সমৃদ্ধ ভূখণ্ড তাদের হতবিস্বাস ও বিভ্রান্ত করে দিয়েছে। কঠোর পরিশ্রমের ফলে তাদের সমস্ত বোধশক্তি লুপ্ত। তারা তাদের চারিদিকের প্রতিটি বস্তুর দিকে করুণ, মিটমিটে, উদাস চোখে বিভ্রান্তভাবে চেয়ে দেখে এবং অসহায়ভাবে একে অপরের দিকে তাকিয়ে মিনমিন করে বলে :

‘আরে আরে, কি সুন্দর জমি !’

‘কথাটা যেন কি, সমৃদ্ধশালী, তাই না !’

‘অবশ্য একটু পাথরে।’

‘না যা-তা জায়গা নয়, এ আমি অবশ্যই বলব।’

আর এর পরই তারা তাদের জন্মস্থান কোবিল লোজোক, সুখোই গোন, মোক্লেনকোঈ-র কথা স্মরণ করে। সেখানকার প্রতি-মূর্তি ধূলো-মাটি তাদের পিতৃপুরুষের চিতাভস্ম, সেখানকার প্রতিটি জিনিস নিখুঁতভাবে তাদের মনে আছে। সেসব তাদের কত পরিচিত ও প্রিয়, তাদের ঘামে ভেজা।

দলের সাথে আরও একজন রমণী ছিল। একটি ঢাঙ্গা, লিকলিকে চোয়াল-বাঁকা মেয়েছেলে। তত্ত্বার মত সমতল তার বুক এবং চোখজোড়া ভাবলেশহীন, কয়লার মত কালো ও টারি।

সন্ধ্যাবেলা সে ও এই হলুদ-স্কার্ফ-মাথায় মেয়েটি সেই কুপাড়ির পেছন দিকে চলে যেত। সেখানে একগাদা পাথরের উপরে বসে সেই ঢাঙ্গা মেয়েছেলেটি হাতের থাবায় খুঁতনিটা রেখে, মাথাটা একদিকে কাত করে, উচ্চকণ্ঠে, ক্রুৎস্বরে গান গেয়ে উঠত :

গ্রামের চার্চটি ছাড়িয়ে

সবুজ ঝোপের মাঝারে

হলুদ বালির উপরে

মোর সাদা ঝকঝকে চাদরটা দেব বিছিয়ে।

সেখানে রইব বসে

মোর সুন্দর প্রিয় আশে,

যখন সে ফিরে আসে

তারে নেব দুই বাহু বাড়িয়ে...

হলুদ-রুমাল-বাঁধা মহিলাটি সাধারণতঃ চুপ করে বসে, মাথা নীচু করে তার তলাপেটের দিকে তাকিয়ে থাকত। কিন্তু মাঝে মাঝে সেও হঠাৎ গানে

অংশ নিভ । গভীর, অলস, প্ৰদূষালী গলার সে সেই গানের কামাত্তরা
কথাগুলো গাইত :

হে প্রিয় আমার,
ওগো প্রিয় প্রাণ,
তোমার কি দেখা
পাবো নাকো আর...

বাঁকিণে রাত্রিবেলায় এই কালো দমবন্ধ করা অশ্বকারের মধ্যে এই
কামাত্তরা কণ্ঠস্বরগুলো মনে করিয়ে দিত উত্তরের কোন এক তুষারাবৃত
নির্জন বনভূমি, তুষার-বন্ধুতার শব্দ ও দ্রবতাই নেকড়ের গর্জন...

তারপর সেই ট'য়ারা মেয়েছেলেটি জ্বরে পড়ে এবং একটি কাপড়ের
স্টেচারে করে তাকে শহরে নিয়ে যাওয়া হয় । সে সেই স্টেচারের উপরে কাঁপে
আর গোঁড়ায়—যেন মনে হয় সে তার সেই চার্চ ও হলুদ বালির গানটি
তখনও গেয়ে চলেছে ।

রুমাল-বাঁধা মাথাটি ভুব দিল—আর দেখা গেল না ।

আমার সকালের খাওয়া শেষ । গাছের পাতা দিয়ে মধুর পাত্রটি ঢেকে
দিলাম । বোঁচকাটা বেঁধে নিয়ে মানুষের চলা-পথ ধরে মন্দির গতিতে হাঁটিতে
লাগলাম । হাতের কর্নেল-গাছের লাঠিটা শক্ত মাটিতে ঠুকে ঠুকে যেতে
লাগলাম ।

রাস্তায় সরু অংশটির উপরে আমি চলে এলাম । আমার ডানদিকে ঘন
নীল সমুদ্র গর্জন করছে । মনে হচ্ছে যেন অদৃশ্য সব ছুতোরমিশ্রী
হাজার হাজার রেঁধা নিয়ে সমুদ্রের উপরে ঘসছে, আর সাদা চাঁছলাগুলো
বাতাসের তাড়া খেয়ে ছুটে তীরের দিকে আসছে । সেই বাতাস ভেজা, উষ্ণ
ও সুগন্ধময়—যেন কোন স্বাস্থ্যবতী রমণীর নিঃশ্বাস । একটি তুর্কী জাহাজ
বন্দরের দিকে মুখ করে জলের উপর দিয়ে স্রব্ধমের দিকে যাচ্ছে । জাহাজের
পালটা স্রব্ধমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সেই নাবুস-নবুস ইনজিনিয়ারের
ফোলা-গালের মত ফুলে রয়েছে । কেন জানি না লোকটা সব সময়ই “সাঁট
আপ”-এর পরিবর্তে “শাশ উপ”, আর “মে বি”-র পরিবর্তে বলে
“মইবী” ।

‘শাশ উপ ! মইবী, তুই নিজেকে স্মার্ট ভাবিস, কিন্তু এই মনুষ্যত্বে তাকে টেনে হিচরে ধানায় নিয়ে যাব !’

সে লোককে ধানায় নিয়ে যেতে খুব ভালবাসত, আর এখন ভাবতে ভাল লাগছে যে কবরের শোকারা ইতিমধ্যে তাকে চেটেপুটে খেয়ে নিছকই হাড়ে পরিণত করেছে ।

আমি কত সাবলিলভাবে হেঁটে চলছি—যেন বাতাসে ভেসে যাচ্ছি । স্নখকর চিন্তা, রং-বেরং-পোষাকে-সজ্জিত স্মৃতিরাজী আমার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে নেচে বেড়াচ্ছে । মনের মধ্যে নৃত্যরত শরীরগুলো যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত—মাথা সাধা, কিন্তু অতল গভীরে তারা শান্ত । সেখানে যৌবনের উজ্জ্বল ও ভাসমান আশাগুলো লোনা জলে রূপালী মাছের মত নীরবে সাতার কেটে চলে ।

রাস্তাটা সমুদ্রের তীরের দিকে এগিয়ে গেছে । ক্রমে ক্রমে তা বালুচরের কাছে, যেখানে ঢেউগুলো এসে আছড়ে পড়ছে, সেখানে গিয়ে মিশেছে । ঝোপের গাছগুলো ফিতের মত রাস্তার উপরে যেভাবে ঝুঁকে রয়েছে ও জলের নির্জনভূমির নীল অসীমের দিকে যেভাবে মৃদু ফিরিয়ে আছে, মনে হচ্ছে তারাও সমুদ্রের দর্শন লাভে অত্যন্ত ব্যগ্ন ।

পাহাড় থেকে বাতাস বয়ে আসছে—বৃষ্টির ইঙ্গিত ।

ঝোপের ভেতর থেকে চাপা গোঙানীর শব্দ আসছে—মানুষের গোঙানীর শব্দ, যা অন্য মানুষের স্বরের অনুরূপিতর তন্ত্রীতে সর্বদাই সাড়া জাগায় ।

আমি ঝোপটা ফাঁক করেই দেখি, সেই হলদুদ-রুমাল-বাঁধা মহিলাটি একটি আখরোট গাছের গঁড়িড়ে হেলান দিয়ে আছে । মাথাটা তার কাঁধের উপর ঝুলে রয়েছে, মৃদু বিকৃত, চোখদুটো স্ফীত, ঠিকরে বোঁরয়ে আসছে । হাতদুটো তার বিশাল পেটের উপর রাখা । আর এমন ভয়ংকর, অস্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে যে পেটটা ঝাঁকানি খেয়ে ফুলে ফুলে উঠছে । সে হাতদুটো দিয়ে পেটটা ধরে গোঙাচ্ছে, আর তার নেকড়ের মত হলদুদ দাঁতগুলো বোঁরিয়ে আছে ।

‘কি হল ? মেরেছে কেউ ?’ তার দিকে ঝুঁকি আমি প্রশ্ন করলাম ।

সে ধূসর ধুলোর উপরে তার নয় পা এলোপাখারি আছড়াতে আছড়াতে,
ভারী মাথা এদিক ওদিক ঘূরিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে উঠল :

‘চলে বাও...তোমার লজ্জা নেই, চলে বাও...’

এতক্ষণে বৃষ্টিতে পারলাম ব্যাপারটা কি—আগে একবার এককম
ব্যাপার দেখেছি। অবশ্যই ভয় পেয়ে আমি পেছনে ফিরে যেতে শুরু করলাম।
কিন্তু মহিলাটি টানা টানা সূরে চিংকার করতে শুরু করল, তার চোখ যেন
ঠিকরে বোরিয়ে আসছে। চোখ জলে ভরা ও লাল উত্তেজিত গাল বেয়ে
জলের ধারা নেমেছে।

এ সব দেখে আমি তার কাছে ফিরে এলাম। বোঁচকা, কেটলী ও চায়ের
পারটা ফেলে রাখলাম মাটিতে। তারপর তাকে চিংকরে মাটিতে ফেলে
হাঁটুজোড়া মূড়ে ওপরের দিকে তুলতে গেলাম। সে আমার মূখে ও বৃকে
আঘাত ক’রে, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। তারপর ঘূরে, হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপের
আরও ভিতরে ঢুকে গেল। মেয়ে-ভালুকের মত ধাঁত-মুখ খিঁচিয়ে চিংকার
করে বলে উঠল :

‘শয়তান ! জানোয়ার !’

তার হাত নেতিয়ে পড়ল এবং সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আবার সে
চিংকার শুরু করে দিল—পা আছড়াতে লাগল।

প্রচণ্ড উত্তেজনায় আমি এ ব্যাপারে যা জানি সব দ্রুত মরণ করে
নিলাম। তাকে ঘূরিয়ে চিং করে দিলাম এবং তার হাঁটুদুটো মূড়ে উপরের
দিকে তুলে ধরলাম—জলভরা পাতলা পর্দাটা ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে।

‘চুপ করে শূরে থাকুন, বেরছে।’

আমি ছুটে সমুদ্রের দিকে গেলাম। হাতা গুটিয়ে, হাতদুটো ধরে
ধাইয়ে কাজ করার জন্য ফিরে এলাম।

দাবানলে বাচ’গাছের ছালের মত মহিলাটি আছাড়ি-বিছাড়ি খাচ্ছে।
সে তার বৃহৎ মাথা দিয়ে আশেপাশের মাটি খামছে ধরছে এবং শূকনো ঘাস
ছিঁড়ে মূখে পূরে দিতে চেষ্টা করছে। ফলে তার বিকৃত, ভয়ংকর,
স্বচ্ছন্দ-মুগ্ধ উপরে কিছু মাটি করে পড়ল। তারপর পাতলা পর্দাটা ছিঁড়ে
গেল ও শিশুর মাথা দেখা দিল। আমি তার বৃ পায়ের দাপানি খামিয়ে

ব্রাখলাম ও শিশুটিকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করলাম, আর লক্ষ্য রাখলাম
যাতে সে বসন্তশা-ব্লিষ্ট মূখে ঘাস ঢোকাতে না পারে ।

আমরা একে অপরকে গালাগাল দিলাম—সে দিল হাত কড়মড় করে,
আর আমি দিলাম নীরবে । সে দিল বসন্তশা ও সম্ভবতঃ লজ্জা থেকে, আর
আমি দিলাম বিরক্তবোধ থেকে, অন্তহীন সমবেদনা থেকে ।

‘ভগবান !’ সে নীল ফেনাভরা ঠোঁটটা কামড়ে ধরে প্রচণ্ড
হাঁফাতে লাগল । আর তার চোখ থেকে অঝোরে ঝরে পড়ছে একজন
ভরকরভাবে-বিধবস্ত-মায়ের চোখের জল । তার চোখ হঠাৎই যেন সূর্যের
আলোতে ঘোলাটে হয়ে গেল । তার সমস্ত শরীর এমনভাবে মোচড় খাচ্ছে যেন
তা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে ।

‘চলে যাও...শয়তান...!’

সে আমাকে তার ভাঁজ-করা হাত দিয়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিতে চেষ্টা
করল, আর আমি তাকে আন্তরিকতার সাথে বললাম :

‘বোকামো করবেন না ! তাড়াতাড়ি ! ব্যাপারটা শেষ হোক !’

ওর জন্য আমার প্রচণ্ড দুঃখ হচ্ছে । মনে হচ্ছে ওর চোখ ফেটে জল
বেরিয়ে আসছে । আমার খুব রাগ হচ্ছে, ভাবছি চিৎকার করে উঠব । সত্যি
সত্যিই আমি চিৎকার করে উঠলাম :

‘জলদি ! তাড়াতাড়ি !’

আরে দেখ—আমার হাতে এসে পড়ল একটা পদার্থ শিশু—একটি লাল
খুদে মানব । আমার চোখ জলে ঝাপসা হয়ে গেলেও দেখতে পেলাম
শিশুটা লাল টুকটুকে । সে ইতিমধ্যেই এই পৃথিবী সম্পর্কে অসন্তুষ্ট হয়ে
উঠেছে । ছটফট করছে, পা ছুঁড়ছে ও আকুলভাবে চিৎকার করছে ।
অবশ্য এখনও সে তার মায়ের নাড়িতে অস্থির । শিশুটির চোখ লাল ।
তার লাল অবয়বহীন মূখে রয়েছে একটা অস্বস্তি’ খুদে চ্যাপ্টা নাক । আর
চিৎকার করার সময় তার ঠোঁটদুটো ফাঁক হয়ে যাচ্ছে :

‘ওঁ রা—রা—রা...ওঁ রা—রা—রা...!’

ওর শরীরটা এত পিচ্ছিল যে আমার ভয় করছে, হাত থেকে না
পিছলে যায় । আমি হট্টগোড়ে বসে, ওর দিকে তাকিয়ে হাসি—ওকে

‘মিনিট খানেকের জন্য সরে যাও ।’

‘লজ্জা পাচ্ছেন কেন ।’

‘ঠিক আছে, তুমি যাও ।’

আমি একটি ঝোপের ভেতর ঢুকে গেলাম । আমার স্বপ্নর বিশাহারা, মনে হচ্ছে উজ্জ্বল পাখীরা আমার বৃক্ষের মধ্যে গান গাইছে । এই অনদ্ভূতির সঙ্গে সমুদ্রের মৃদু গর্জন এতই চমৎকার যে আমি বছরের পর বছর ধরে তা শুনতে পারি ।

কাছে কোথাও কোন ছোট নদীর কলতান শোনা যাচ্ছে । যেন কোন তরুণী তার বাস্তবীর কাছে প্রিয়জনের গম্প করছে ।

ঝোপ ছাড়িয়ে হলুদ-রুমাল-বাঁধা একটি মাথা দেখা গেল—রুমালটা এখন ঠিকভাবে বাঁধা ।

‘এই যে, কি ব্যাপার ? খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল—তাই না ?’

ঝোপের কয়েকটা ডাল ধরে ফ্যাকাশে মুখে সে সেখানে বসে পড়ল—যেন তার জীবনীশক্তি শেষ হয়ে গেছে । চোখজোড়া তার বৃটো নীল জলের সরোবর । হেসে, কোমল আবেগে সে ফিসফিস করে বলল :

‘দেখ কেমন ঘুমিয়ে আছে ।’

আমারও মনে হচ্ছে সত্যি কি স্বপ্নরভাবে ঘুমিয়ে আছে, আর দশটা শিশুর সাথে কোন পার্থক্য নেই । যদি কোন পার্থক্য থেকে থাকে তা হ’ল পরিবেশের । ঝোপের নীচে, শরতের উজ্জ্বল পাতার ঢিপির উপরে সে শূন্যে আছে । এ ধরনের গাছ ওরেলের গ্রামে জন্মায় না ।

‘আপনার শূন্যে পড়া উচিত, মা ।’

‘না’, দৃর্বলভাবে সে মাথা নেড়ে জবাব দিল । ‘আমাকে পরিষ্কার হয়ে নিতে হবে এবং সেই জায়গাটার যেতে হবে—কি যেন নাম ?’

‘ওক্কেচিরী ?’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ । আমার বলের লোকেরা এতক্ষণে বেশ কয়েক মাইল এগিয়ে গেছে ।’

‘আপনি নিশ্চয়ই হেঁটে যাবেন না ?’

‘পবিত্র ভার্জিন সহায় । তিনি আমার সাহায্য করবেন ।’

বেশ, পবিত্র ভার্জিন বশন তার সহায়, আর আমার বলার কিছুই নেই !

সে চোখ নামিয়ে কুণ্ঠিত ছোট্ট মৃদুখটির দিকে তাকাল । চোখজোড়া তার
করুণার আলো ছড়চ্ছে । সে তার ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে হাত দিয়ে ধীরে ধীরে
তার বুক চাপড় মারল ।

আমি চারিদিকে পাথর বসিয়ে আগুন জ্বাললাম, যাতে কেউলি বসান যায় ।

‘মিনিট খানেকের মধ্যেই আপনার জন্য চা বানিয়ে দিচ্ছি, মা ।’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, কর ! আমার বুকটা বেশ শক্ত করে মরুভূমি হয়ে গেছে ।’

‘বলের লোকেরা আপনাকে ফেলে গেল কেন ?’

‘না, না—তারা ফেলে যায় নি । আমি পেছনে থেকে গিয়েছিলাম ।
জানো তো, ওদের কাছে এক রকমের মদ আছে...আর সেটা যে কি ভাল ॥
ইচ্ছে করছে তা খেয়ে এখানে ঘুরে বেড়াই ।’

সে আমার দিকে তাকিয়ে কনুই দিয়ে মৃদুখটা ঢেকে ফেলল । তারপর
স্নিক্ত সলসল হাসিতে ভরে উঠল মৃদুখ ।

‘আপনার কি এই প্রথম ?’

‘হ্যাঁ । তুমি কে ?’

‘এই ধরুন একটা মানুষ, কিছুটা বলতে পারেন... ।’

‘তা তো দেখতেই পাচ্ছি । তুমি কি বিবাহিত ?’

‘সে সম্ভান এখনও কুড়োতে পারিনি ।’

‘ঠাট্টা করছ !’

‘না, ঠাট্টা করছি না ।’

সে চোখ আনত করল, তারপর বলল :

‘তা হ’লে এসব মেয়েলী ব্যাপার জানলে কি করে ?’

এবার আমার ঠাট্টা করতে হল ।

বললাম, ‘শিখেছি । আমি একজন ছাত্র—ছাত্র কাকে বলে আপনি
জানেন ?’

‘জানি । আমাদের পদ্রোহিতের বড় ছেলেরা একজন ছাত্র । সে পদ্রোহিত
হবার জন্য পড়ছে ।’

‘হ্যাঁ । আমিও সেরকম একজন । যাই কিছু জল নিয়ে আসি ।’

কমণীটি মাথাটা নীচু করে শিশুটির শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করে সমুদ্রের দিকে তাকাল।

‘আমি একটু পরিষ্কার হয়ে নিতে পারতাম, কিন্তু এখানকার জল কেমন জানি না। জলটা কেমন? নোনতা, তেতো?’

‘হান পরিষ্কার হয়ে আসুন—খুব ভালো জল।’

‘সত্যি?’

‘হ্যাঁ। ঐ নদীর জলের চেয়েও এই জল বেশী গরম—নদীর জল বরফের মত ঠান্ডা।’

‘বলছ যখন...’

একজন আবখাজিয়ান একটা ঘোড়ার পিঠে বসে দু দিকে দুই পা ঝুলিয়ে হেঁটে চলার গতিতে চলছে—মাথাটা বৃকের কাছে ঝুঁকে পড়া। তার শীর্ণকায় খুঁড়ে ঘোড়াটা কান ঝুলিয়ে, আমাদের দিকে গোল গোল জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে ভৌস ভৌস শব্দ করল। অশ্বারোহী ঝাঁকুনি দিয়ে মাথাটা তুলল। তার মাথায় রয়েছে জীর্ণ পশমের টুপি। আমাদের দিকে তাকিয়েই সে আবার মাথা নীচু করল।

‘এলাকার মানুষগুলো কেমন অসুস্থ, ভয়ঙ্কর দেখতে’, ওরেল মহিলাটি শাস্ত গলায় বলল।

আমি জল আনতে গেলাম। পারদবর্ণ, স্বচ্ছ জলের স্রোত পাথরের উপরে লাফিয়ে এসে পড়ছে। ওর মধ্যে শরতের পাতারা আনন্দে ঘূরপাক খাচ্ছে। চমৎকার! আমি হাত মুখ ধুয়ে, কেটলিটা ভরে ফিরে এলাম। কোপের ফাঁক দিয়ে দেখলাম মহিলাটি হামগর্দড়ি দিয়ে এগুচ্ছে এবং উত্তেজিত ব্যাবার পিছন ফিরে তাকাচ্ছে।

‘কি ব্যাপার?’

সে চমকে উঠল, তার মুখ ফ্যাকাশে। সে শরীরের নীচে কি যেন লুকোতে চেষ্টা করছে। আমি বৃকতে পারলাম জিনিসটা কি।

‘আমাকে দিন, পর্দাতে ফেলছি।’

‘ওঃ! বাছা আমার! কিন্তু এটা স্নানঘরে, কোন ছাদের নীচে পর্দাতে হবে...’

‘আপনার কি মনে হচ্ছে এখানে শিগ্গিরি কেউ স্নানঘর তৈরী করবে?’

‘তুমি ঠাট্টা করছ, কিন্তু আমার ভয় করছে। যদি কোন জন্তু খেয়ে ফেলে, তাহলে। এগুলো মাটির নীচে পড়তে হবে।’

সে মৃদুটা ঘূরিয়ে নিয়ে, আমার হাতে একটা ভেজা ভারী পোটলা দিয়ে লজ্জাভরে, নম্রস্বরে বলল :

‘কাজটা ঠিকভাবে করতে হবে, অনেকটা গর্ত খুঁড়ে পড়তে হবে, করবে তো? ঈশ্বরের দোহাই...আমার বাচ্চার দোহাই, ঠিকভাবে ক’রো, দোহাই...।’

আমি ফিরে এসে দেখি সে সমুদ্রের তীর থেকে আসছে। পা ফাঁক করে করে, হাত দুটোকে ছড়িয়ে আসছে। কোমড় পর্যন্ত তার শ্কার্ট ভেজা, মৃদু ঈষৎ লালচে, যেন ভেতর থেকে কোন আভা আসছে। আমি তাকে আগুনের কাছে নিয়ে এলাম। বিস্ময়ে মনে মনে ভাবছি :

‘কি আত্মরিক শক্তির বাবা!’

তারপর আমরা মধু দিয়ে চা খেলাম, সে শাস্তভাবে প্রশ্ন করল :

‘তুমি পড়া ছেড়ে দিয়েছ?’

‘হ্যাঁ।’

‘মধু খাও নিশ্চয়ই?’

‘হ্যাঁ, মধু খেয়ে শেষ হয়ে গেলাম, মা!’

‘কি লজ্জার কথা! মনে আছে, স্মৃতিমে যখন তুমি ম্যানেজারের সঙ্গে খাবার নিয়ে ঝগড়া করতে আমি তোমাকে দেখতাম আর মনে মনে বলতাম : ছেলেটা নিশ্চয়ই মাতাল, কাউকে ভয় পায় না।’

সে তার ফোলা ঠোঁট থেকে মধু চেটে নিল এবং ঘে-ঝোপের কাছে সেই সদ্যজাত গুরিলেটী নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছে সেখানে তার নীল চোখজোড়াকে বারবার ঘূরিয়ে নিতে লাগল।

‘ভাবছি ও কিভাবে বড় হবে?’ দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল। ‘তুমি সাহায্য করো—সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, কিন্তু এটা কি ওর পক্ষে ভাল হবে,...আমি ভাবছি...।’

খাবার ও চা খাওয়া শেষ হ’লে সে নিজের উপর ক্রশ টিঙ্ক আঁকল,

আর আমি আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে লাগলাম। সে শরীর বদলিয়ে
কিম্বদন্তে লাগল। দৃষ্টি তার মাটির দিকে নিবন্ধ—চোখ যেন আবার
উদাস হয়ে গেছে। তারপর সে উঠে দাঁড়াল।

‘সত্যিই যাচ্ছেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘আপনি কি নিশ্চিত, আপনি চলতে পারবেন?’

‘ভার্জিন মেরী আমার সহায়! ওকে আমার কাছে ধাও!’

‘আমি ওকে নিচ্ছি।’

কিছুক্ষণ তর্কাতর্কির পর সে রাজী হল এবং আমরা যাত্রা শুরুর করলাম
—পাশাপাশি, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

‘আশা করি আমি হেঁচট খাচ্ছি না’, সে বিনীত হাসি হেসে বলল।
তার হাত আমার কাঁধে।

রাশিয়া-ভূখণ্ডের নতুন বাসিন্দা, অজানা-ভাগ্যের এই মানুষটি এখন
আমার হাতের মধ্যে রয়েছে—সে তার নাক দিয়ে বড়বের মত শ্বাস করছে।
সমুদ্র সাধা ফেনায় অলঙ্কৃত হয়ে শ্বাস করছে, গর্জন তুলছে। ঝোপগুলো
একে অপরের সাথে ফিসফিস করে কথা বলছে, সদ্য তার মধ্যগগনের আলো
ছড়িয়েছে।

আমরা ধীরে ধীরে হেঁটে চলছি। মা মাঝে মাঝেই থেমে দাঁড়িয়েছে।
মাথা পেছন দিকে ঝুঁকিয়ে সে তার দৃষ্টি সমুদ্র, বন, পাহাড়, এবং শেষে তার
ছেলের মুখের উপর রাখছে। যন্ত্রণার-অশ্রুতে-সিক্ত তার চোখদুটো পুনরায়
বিস্ময়কর রকম নিশ্চৈ হয়ে পড়ল। অফুরন্ত ভালবাসার নীল আলোয়
সে দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

একবার সে থেমে বলল :

‘ভগবান! হে ঈশ্বর, কি বিস্ময়কর এই শিশু! কি চমৎকার! আমি
এর সাথে, আমার এই ছোট্ট শিশুটির সাথে এইভাবে পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত
যেতে পারি—সে, আমার প্রিয় ছোট্ট খোকা, তার মায়ের বৃকে স্বাধীনভাবে
বড় হবে, আর বড় হবে...।’

সমুদ্রের মৃদুগর্জন উঠছে, আর উঠছে.....।

কমরৈড

এ শহরের বিষয় অস্বাভাবিক ও দুর্ভেদ্য। গীর্জার আকাশমুখী বিচিত্র গম্বুজ ছাড়িয়ে কল-মিলের প্রাচীর ও চিমনিগুলো মাথা উঁচু করে আছে। মনে হয়, বণিকদের ঘনসমীপবিস্তৃত অট্টালিকার প্রাণহীন ইট-কাঠ-পাথরের গোলক-ধাঁধার গীর্জাগুলো ঝাপসা ও বিবর্ণ। যেন ধূলা ও ভয়ঙ্করের মধ্যে চাপা পড়ে আছে কিছূ সুন্দর ফুল। সকাল সন্ধ্যায় প্রার্থনাকারীদের উদ্দেশ্যে গীর্জার ঘণ্টার ধাতব আওয়াজ ছােৱে লোহালকরে আছাড় খেয়ে সুউচ্চ প্রাসাদের সঙ্কীর্ণতার হারিয়ে যায়।

শহরে অট্টালিকার সংখ্যা প্রচুর এবং অধিকাংশই সুন্দর, অভিজ্ঞাত কিন্তু ভিতরে বাসা বেঁধে আছে এক প্রকার নোংরা ও ঘৃণা জীব। উদ্যাস্ত ধেরে-ইন্দুরের মতো তারা কেবল ইতস্তত অলিগলিতে চলাফেরা করে। কেউ বা স্থল আমোদ, কেউ বা লোলুপ দৃষ্টিতে রুটির সম্বন্ধে বাস্তব। এ ছাড়াও প্রকাশ্য রাস্তার মোড়ে মোড়ে কিছূ মানুষ ভুখা, দুর্বলতার প্রতি এমন তীক্ষ্ণ, সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখছে যাতে প্রতিষ্ঠাবানদের প্রতি এই সব দীন-ধীরদের বিনয় আচরণের কোন অভাব না ঘটে। স্বভাবতই প্রতিষ্ঠাবানরা হল শহরের ধনী সম্প্রদায়। এখানে অর্থ হল ক্ষমতা ও স্বাধীনতার সারবস্তু। প্রত্যেকেই ক্ষমতালোভী কারণ তারা গোলাম, তাই ধনীর বিলাস-বাসন গরীবের হিংসা ও ঘৃণার বস্তু এবং এ শহরে স্বর্ণালংকারের রিনিঝিনিই হল মৃদু ও মধুর সঙ্গীত। এখানে মানুষ পরস্পরের শত্রু এবং হিংস্র পথে চালিত।

কখনো-সখনো শহরের আকাশে আলো-ঝলমল সূর্যের সাক্ষাৎ মেলে, কিন্তু জীবন এখানে সর্বত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন; মানুষগুলো যেন ছায়ামূর্তি। রাতে শহরের বুকে অসংখ্য উজ্জ্বল আলো জ্বললেই, ক্ষুধাতুরা কামিনীগণ সামান্য অর্থের আশায় ভালোবাসার ছলাকলা বিক্রীর উদ্দেশ্যে পথে নামে। এ সময়ে বিভিন্ন সুস্বাদু খাব্যের দ্বাণে উপবাসীর চোখজোড়া ক্ষুধার আগুনে নীরব ক্রোধে জ্বলতে থাকে—মনে হয় শহরের আকাশে বাতাসে দারিদ্র্যের কণা, চাপা, বস্ত্রশাক্তর গোঙানী প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। জীবন এখানে বিষয়

ও উবেগপদ'। অধিকাংশই বিপথে চালিত, অবশ্য কিছু সংখ্যক মানুষের পৌরুষ আছে, কিন্তু তাদেরও হ্রস্ব হিংস্রতা ও পশুশক্তিতে আচ্ছন্ন।

এখানে প্রত্যেকেই বেঁচে থাকতে আগ্রহী কিন্তু সঠিক পথ তাদের জানা নেই। কেউই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কাম্বিক্ত জীবনযাত্রায় এগিয়ে যেতে সাহস পায় না। ভবিষ্যৎ স্বপ্নের উদ্দীপনার করেকাট পদক্ষেপের পরই ভয়াবহ বর্তমান পিছন হটে আসতে বাধ্য করে। কারণ সে এখন ঘৃণ্য, লোভী এক দৈত্যের নিষ্ঠুরবাহুপেষ্ণে আবদ্ধ। অসহায় এক মুক যন্ত্রণাবিন্ধ্য মানুষ তাই জীবনের এই কুৎসিত রূপ দেখে শিউরে ওঠে। সে বীভৎস রূপ তার অন্তরে হাজার হাজার বিষম ও অসহায় দৃষ্টি মেলে ভাষাহীন এক প্রার্থনা জানায়। অন্যদিকে ভবিষ্যতের উদ্দীপনাটুকু হারিয়ে যেতেই প্রতিটি মানুষের অক্ষম আত্মনাথ জীবনবেদীতে বিক্ষত আর দশটা হতভাগ্যের ক্রম্বনধ্বনির সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। এখানে ছায়ার মতো লেগে আছে বিষাদ ও উবেগ—কখনও বা সন্ত্যাস। গীর্জা-আড়াল-করা পাষণশূন্যকে বুকে নিয়ে, ধূসর অন্ধ শহর অসংখ্য মানুষকে উদ্বিগ্ন করে স্থিরনিশ্চল। যেন কারারুদ্ধ সে মানুষগুলো চিরদিন সূর্যের আলো থেকে বঞ্চিত থাকবে। এখানে জীবনের সজ্জীত হল যন্ত্রণা ও ক্রোড়ের চাপা ক্রন্দন, অবরুদ্ধ ঘৃণার মৃদু হিসহিসানি, ভয়সঞ্চারী নিষ্ঠুরতার উল্লাস এবং জৈবিক হিংস্রতার উন্মত্ততা।

দুই

তবুও চারিদিকের এই দুঃখ, দুর্ভাগ্যের বিষম আবর্তে, লোভ ও অভাবের পিচ্ছিল কবলের মধ্যে, আতঙ্করিতার চোরাবালিতে, সামান্য সংখ্যক স্বপ্নচারী সবার অলক্ষ্যে শহরের নীচুতলায় ঘুরে বেড়ায়। সেখানে বাস করে অগণিত সর্বহারা, যাদের প্রমে গড়ে উঠেছে শহরের ঐশ্বর্য এবং ইমারত। ঘৃণা ও উপহাসের মধ্যেও মানুষের প্রতি অগাধ বিশ্বাসে স্বপ্নচারীরা বিপ্লবের বাণী প্রচার করে। এক কথায় তারাই হল খাঁটি সত্যের ভবিষ্যৎ অগ্নিশিখার এক একটি বিপ্লবী স্ফুলিঙ্গ। সেখানে তারা সর্বক্ষণ সজল, মহান শিক্ষার এক ক্ষুদ্র ফলপ্রসু বীজ বহন করে বেড়ায়; কঠিন প্রত্যয়ে, হ্রস্বের মৃদু উত্থাপ ও ভালোবাসার শীতল সপ্রভ দৃষ্টিতে মানুষগুলোর ভারাক্রান্ত

জীবনের পরে উজ্জ্বল, অদলভ সত্যের বীজ বপন করতে থাকে—বীর্ষধীন যাবৎ যে মান্দুষ্যগুলো কেবল লোভী, অত্যাচারীদের হাতে মনুষ্য হারিয়ে নিছকই ঐশ্বর্য উপাধনকারী মূক পশুতে পরিণত হয়েছিল। নীচু ভলার সেই-সকল মান্দুষ্য এক শব্দের কব্বারে কেমন বিহ্বল হয়ে থাকে, ঠিক বিশ্বাস করতে চলে না। অথচ তাদেরই প্রাপ্ত স্বপ্নগুলো সেই কব্বারের জন্য বীর্ষধীন ব্যাকুল হয়ে ছিল। তাই এ শব্দের মন্দ ব্যাঙ্গনায় শক্তিশালী উপশীড়কের মিথ্যা ছলনার পাশ ছিন্ন করে মান্দুষ্যগুলো ধীরে ধীরে আপন আপন মাথা তুলতে থাকে।

ক্রোধ-চাপা ধসের প্রাত্যহিক জীবনে, নানা অন্যায়ের বিবে জর্জরিত হ্রস্বে, বিস্ত্রশালীর মিথ্যা পান্ডিত্যের শিকার হয়ে, গ্রানি ও বণ্ডনার আকর্ষণ-নির্মজ্জিত মান্দুষ্যগুলোর কাছে যেন এক সুন্দর, উজ্জ্বল বস্তু নিক্ষেপিত হল : 'কমরেড !'

শব্দটি এ মান্দুষ্যগুলোর কাছে অপরিচিত নয়, তারা পূর্বেও শুনেছে, মনে মনে উচ্চারণ করেছে, কিন্তু তখন গতানুগতিক কণ্ঠা নীরস বস্তুর মতো মনে হয়েছে ফাঁকা ও বিবর্ণ। কিন্তু আজ সে এক নির্মল, সুদৃঢ়, নতুন বাস্তব ইঙ্গিত নিয়ে হাজির হয়েছে, যেন মহামূল্যবান এক হীরকখণ্ড।

আন্তরিকভাবে এই মান্দুষ্যগুলো কোমল অপত্যস্নেহে মনের মধ্যে শব্দটিকে পোষণ করে, অনেকটা স্নেহময়ী মায়ের সন্তানকে ধোলার ধোল দেবার মতো। যতই সেই উজ্জ্বল শব্দটির গভীর মর্মস্থলে প্রবেশ করা যায়, ততই মনে হয় সুন্দর ও তাৎপর্ষ্যপূর্ণ। তাদের ঠোঁট মৃদু নড়ে ওঠে : 'কমরেড !'

এ ধর্মির মধ্যে তারা উপলব্ধি করে বিশ্বব্রাহ্মণের বাণী, স্বাধীনতার উচ্চাশ্বরে মাথা তুলবার আহ্বান এবং সমস্ত মান্দুষ্যকে এক নতুন বন্ধনে আবদ্ধ করার স্পৃহা, যে বন্ধন হল মনুষ্যস্বত্ব প্রম্ভা ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান। এই গভীর অর্থবহ ধর্মি বন্ধন শহরের নিম্পেষিত গোলামদের অন্তরে শিকড় বিস্তার করে, মনের মৈন্য ছিন্ন হয়ে যায়। একদিন তারাই এই শহুরের সম্ভ্রান্তদের উদ্দেশে বলে : 'বধেপ্ট হয়েছে, আর নয়।'

তখনই জনজীবন স্তম্ভ হয়ে যায় কারণ এরাই হল সচল জীবনযাত্রার মূল চালিকা-শক্তি। শহরের জলপ্রবাহ বন্ধ, চুন্নির অগ্নি নির্বাণিত, ঘন অন্ধকারে হুউচ্চ প্রাসাদগুলি নির্মজ্জিত। মহাশক্তির ধনীদেব মনে হয় অসহায়, অনাথ। ভয় তাদের গ্রাস করে। আপন জজালের পুত্তিগন্ধময় প্রকাণ্ডে আবদ্ধ হয়ে, নীচুতলার বিদ্রোহীদের প্রতি চিরদিনের ঘৃণাকে আপাত-দমন করে রাখে কারণ শহরের নীচুতলার মানবদেবের বিপুল শক্তিতে এই সকল বিকশালীরা এখন বিস্মরাভূত। ক্ষুধার বিভীষিকা তাড়া করে বেড়ায় এবং অন্ধকারে শোনা যায় শিশুদের করুণ আতর্নাদ। প্রাণহীন লোহা-পাথরে-ঠাসা প্রাসাদ ও গীর্জার বিধাবের ছায়া, পথে-ঘাটে শীতল মৃত্যুর মতো অশুভ নীরবতা। এতদিন বারা শব্দ রথের চাকাই টেনে গেছে, তারা সচেতন হয়ে ওঠার জনজীবন স্তম্ভ। শহরের এই সকল গোলামরা এক বাদ-বলে যে অজ্ঞেয় আত্মশক্তির সম্মান পেয়েছে তা হোল স্ফুটীশক্তি।

বিকশালীদের পক্ষে এ দিনগুলো বড় বৃৎসহ। এতদিন বারা নিঃস্বের শব্দ প্রভু বলে মনে করত, তাদের কাছে অন্ধকার রাত অনন্তপ্রসার এবং বিধাবপূর্ণ। প্রাসাদের ক্ষীণ আলো এতই নিঃপ্রভ ও করুণ—মনে হয় শত বৎসরের প্রাচীন শহরটার মৃতদেহের ওপর রক্তলোভী এক দৈত্য ইট-কাঠ-পাথরের জঘন্য কুৎসিত চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। অন্ধ জানালাগুলো বিকর ক্ষুধিত বৃষ্টিতে রাজপথের দিকে তাকানো, যেখানে চলছে জনজীবনের সত্যিকারের প্রভুদের আজ নতুন উদ্যমে পদচারণা। তারাও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ক্লান্ত, এমনকি গৃহে-আবদ্ধ মানবগুলোর চাইতে একটু বেশীই, কিন্তু এ ক্লান্তি ধনীদেব মতো তাদের অসহায় করে তোলেনি কিংবা হৃদয়ের উজ্জ্বল দীপশিখাকে এতটুকু নিঃপ্রভ হতে দেয়নি। বরং আত্মশক্তিতে উৎসীপিত হয়ে তাদের চোখে মূখে জয়ের প্রত্যাশা। যে শহর এতদিন তাদের কাছে ছিল গদ্যমোট, রুদ্ধকণ্ঠ এক কারাগার, যেখানে তাদের ভাগ্যে শব্দ জড়ুত নিদারুণ অবজ্ঞা ও উপহাস এবং কত-বিকৃত হ্রস্বে জমে উঠত পাহাড় প্রমাণ অভিবোগের স্তম্ভ, সেই শহরের রাস্তায় আজ মানবগুলো ধীরে বেড়াচ্ছে মাথা তুলে। এতদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতার তারা বৃৎসে প্রমের তাৎপৰ্য, আজ সে আলোতেই জীবনের প্রভু হবার পবিত্র অধিকার সম্বন্ধে তারা সচেতন। তারা

শহরের নতুন সৃষ্টি ও বিধানকর্তা। তাই এক নতুন শক্তি, নবজীবনের বাতাবিহ অতি উজ্জ্বল শব্দটি বেজে উঠল : ‘কমরেড !’

এ যেন বর্তমানের প্রবক্তনাময় হাজার শব্দের মধ্যে ভবিষ্যতের এক অমূল্য বাণীমন্ত্ৰ। নতুন যে জীবনের জন্য এতদিন মান্দুগদুলো উদ্ভূত হয়ে ছিল, আজ কি তার লগ্ন আগতপ্রায়, না এখনও তা মরীচিকা ? ব্যাপারটা তাহেরই স্থির করার কথা। যে-মুষ্টির দিকে আজ তারা ধাবমান, এতদিন নিজেরাই তার আগমনকে বিলম্বিত করে তুলেছিল।

তিন

অধঃভুক্ত, পশুর-জীবনে-অভ্যস্ত যে গণিকাটি পথের মোড়ে সামান্য অর্থের বিনিময়ে নিজেকে নিষ্ঠুর পেয়ণের হাতে বিকিয়ে দেবার জন্য অপেক্ষমানা, তার কাছেও শব্দটা পৌঁছাল। মৃদু হেসে হতবুদ্ধিপ্রায় হয়ে সে ধানিটিকে পুনঃউচ্চারণে সাহস পেল না। গলির মোড়ে নবাগত এক পথিক এসে অতি প্রিয়জনের মতো গণিকাটির কাঁধে মৃদু স্নেহস্পর্শ দিয়ে বলে উঠল : ‘কমরেড !’

উদ্বেলিত অশ্রুকে সেই হতভাগিনী সলজ্জ হাসির মধ্যে গোপন করে রাখল, কারণ এতদিনের কলদূষিত হৃদয়ে এ আনন্দের স্বাদ তার কাছে নতুন। তাই এতদিন যে-চোখে সে পৃথিবীর দিকে ক্ষুধার্ত ও নির্লজ্জের দৃষ্টি বান করছে সেখানে দেখা গেল টলটলে পবিত্র কয়েক ফোঁটা অশ্রু। এই মৃদুহৃতে শহরের বুকে, পৃথিবীর সমস্ত নিষ্পেষিতদের, এক পরিবারভুক্ত এই সব অপাতঙ্গেরদের আনন্দের হাসি পথে পথে আলোকমালার মতো জ্বলতে থাকলে স্তম্ভিত প্রাসাদের নিম্প্রভ জানালাগুলো নিষ্ঠুর ও অক্ষম দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

পথের ধারে যে ভিক্ষুকটির কাছে গতকালও বিরক্তিতে বিবেক-তাড়নায় কোনো মূল্য হাতের একটা ঘষা-আখলা ছটকে পড়ত, আজ সেখানেও শব্দটি পৌঁছে গেল। নতুন ভিক্ষালব্ধ বস্তুটিতে এতদিনের দারিদ্র্য-রিক্ত হৃদয় আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার দুলতে থাকে।

উলিঙ্গুলি গাড়োরানটা এতদিন শব্দ বাগীঘের তাকনার দ্বর্ভল ঘোড়াটাকে চাবুক মেয়ে দ্রুত ছোটবার জন্য ব্যস্ত ছিল। আজীবন চাবুকের হিস্‌হিস্‌নি ও শব্দ রাস্তার চাকার আওয়াজ শব্দে শব্দে তার চেতনা হয়ে গিরোছিল ভোতা। সেও আজ শব্দ হেসে পথিককে জিজ্ঞেস করল :

‘গাড়ির দরকার কমরেড ?’

তার মস্ত লাল মুখে একদিকে হাসির ছটা, অপরদিকে ভয়ে পথিকটির কাছ থেকে লাগাম গুটিয়ে দ্রুত পালাবার চেষ্টা। পথিকটি শব্দ হেসে মাথা দুলিয়ে জবাব দিল : ‘না কমরেড, আমি বেশীদূর যাব না।’

রাস্তার চাক চাক জনতার গুঞ্জন। সমস্ত বিশ্বকে আপন করবার মহাশক্তির স্ফুলিঙ্গের মতো শব্দটাকে নিয়ে রাস্তায় মানদুষগুলো আপন আপন স্থানের মধ্যে লোফাল্‌ফি করতে লাগল : ‘কমরেড !’

মস্ত গোফ নিয়ে ধূসর পোষাকের এক পদলিগ গভীর চালে ছোটখাট একটা ভিড়ের সামনে এল। সেখানে পথসভা করছিল এক বৃন্দ। খানিক তার বস্তব্য শব্দে পদলিগটি ফিস্‌ফিস্‌ করে উঠল :

‘পথসভা নিষিদ্ধ ভদ্রমহোদয়গণ, ... আপনারা যে যার কাজে সরে পড়ুন।’

মুহুর্তের নীরবতার, আনত দৃষ্টিতে সেও গোপনে বলে উঠল : ‘কমরেড !’

বিশ্বদ্রাত্ত্বের গভীর অর্থবহ শব্দটাকে বারা অন্তরে স্থান দিয়ে অস্থি-মজ্জার মিশিয়ে নিরেছে, তাহের চোখেমুখে নতুন জীবন-সৃষ্টির গর্ব। এ শব্দের মধ্যে তারা যে শক্তি খুঁজে পেয়েছে তা অফুরন্ত ও অজ্ঞেয়।

এঁহেন মানদুষের বিরুদ্ধে পুরাতন অত্যাচারীরা ধূসর কিছু অস্ত্রধারী নামিয়েছে, তারা রাস্তার মোড়ে মোড়ে সার বেঁধে এমনভাবে প্রস্তুত, মনে হয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেগে উঠবার জন্য এখনই শব্দ হবে ধমন-পাড়ন।

কবে কোন মানদুষের হাতেগড়া, কঠিন প্রাচীরে ঘেরা পুরাতন শহরটির অস্থ-গলির অভ্যন্তরেও মনদুষ্যের প্রতি এক হৃগভীর অনুরাগ ছড়িয়ে পড়তে লাগল : ‘কমরেড !’

যন্ত্রস্ত্র শুল্লিঙ্গ জ্বলছে। সেখান থেকেই দ্বীনরার মান্দুকে সম্বন্ধ-
 করার দাবানল সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করবে। ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংস্রতা—যা
 মান্দুকে পশুর স্তরে নামিয়ে আনে—একে একে সে-আগুনে দগ্ধ হবে।
 তারপর প্রতিটি মান্দুকের হৃদয় গলে গলে পরিণত হবে একটি হৃদয়ে। সে
 হৃদয় হল মৃত্ত দ্বীনরার স্বাতন্ত্র্য-বন্ধনে-আবদ্ধ সমস্ত প্রাণিক পরিবারের নারী-
 পুরুষ নির্বিশেষে একটি মহান উচ্চ হৃদয়।

দাসত্বের-বন্ধনে-আবদ্ধ মান্দুকের হাতে-তৈরী মৃত শহরের পথে পথে,
 এত দিনের হিংস্র কুটিল শহরের পথে পথে, মান্দুকের আত্মবিশ্বাস নিজের ও
 পৃথিবীর অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছে। ক্রমশই সে নতুনতর শক্তিতে
 বলীমান হয়ে উঠছে। চাপা অস্বস্তিকর, বিষাদময় পরিবেশে উজ্জ্বল, সপ্রতিভ,
 আলোকবর্তিকার মতো সরল আন্তরিক শব্দটা ভাস্বর হয়ে উঠল : ‘কমরেড !’

কবি

জিমনাস্টিক ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরে সুরা পোষাক পালেট সোজা চলে এল খাবারঘরে। লক্ষ্য করল টেবিলে বসে মা তাকে দেখে মূর্চক হাসছে। বিষয়টা একটু অস্বাভাবিক। স্বভাবতই এ পরিদৃষ্টিতে সুরার কোতুহল জাগে। কিন্তু সে আর এখন ছোট খুঁকিটি নয়, ভারি হতে চলেছে; অহেতুক প্রশ্ন করে কোতুহল প্রকাশ করা তার সম্ভবে বাঁধে। মাস্তের কপালে ছোট চুম্ব খেয়ে, আরনার এককলক নিজের চেহারাটি দেখে চেয়ারে বসে পড়ল। এখানেও অন্যান্য ঘিনের তুলনার কিছু অস্বাভাবিকতা। টেবিলটি সুসজ্জিত এবং পটভূমির আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাহলে বিষয়টি আর কিছুই নয়, অতিরিক্ত কাউকে হঠাৎ খাবার টেবিলে আমন্ত্রণ জানান হয়েছে। সামান্য হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। মা বাবা এবং কাকিমার সমস্ত বন্ধু-বান্ধব তার পরিচিত। তাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যে নাকি সুরার কাছে চমৎকার এবং মজার মানুষ। ভগবান! কিরকম সব একত্রে তারা। কিরকমভাবে পরিদৃষ্টিটাকে বিরক্তিকর করে তোলে! উদাসীন ভঙ্গিতে মাকে বাড়তি চেয়ারটা দেখিয়ে বললো, ‘কার জন্য?’ কিছু বলার আগে মা কিশ্বঘাড়ি ও ঘোলাঘাড়ির সমস্ত মিলিয়ে, জানলার দিকে তাকিয়ে কান খাড়া করে কিছু শুনবার চেষ্টা করল। শেষে সুরার দিকে মুখ ঘুরিয়ে মূর্চক হেসে বললো, ‘আম্বাজ করো না!’

‘উঃ, মজা কয়ছ কেন?’—বলেই সুরা বদ্বতে পারলো আবার সে দারুণ কোতুহলী হয়ে উঠেছে। তার স্মরণ হলো এবার, বাড়িতে ঢোকবার সময় কি লদাব মাসী বরজা খুলে অস্বাভাবিক ভাবেই বলোছলো, ‘এসে পড়েছ? বাঃ খুব খুশি হলাম।’

তার ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে লদাবার খুশি হওয়া খুব বিয়ল ঘটনা, তা আবার এমন জোর-গুলায় প্রকাশ করা। সুরা খুব ভালভাবেই জানে এক-ত্রে গৃহজীবনের বাঁধা-বন্ধ রুটিনের মধ্যে সামান্য পরিবর্তনের হাওয়া ডেউ

তুললেই তা অন্তর্যঙ্গিতের দ্বারা পড়ে যায়, কারণ বৈচিত্রের জন্য তার চিত্ত সধা-
চঞ্চল ।

‘হ্যাঁ, হয়তো ঘটনাটা খুব মজারই হবে । ভাবতে চেষ্টা করোনা !’ মা
একইভাবে রহস্য করল ।

স্বাভাবিক কথাবার্তার ধরন থেকেই সে নিশ্চিত ছিল একটা কিছ-
দ আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেতে যাচ্ছে, বেশ আশ্চর্যজনক কিছ-
দ । কিন্তু বেচে
জিজ্ঞাস করায় সে উৎসাহী ছিল না ।

‘আর কি ! কোথা থেকে কেউ হয়তো আসবে, এই তো ?’—কৌতুহল
চেপে রাখল সে ।

‘সেতো ঠিকই’—মা মাথা নাড়লেন, ‘কিন্তু কে ?’

‘জেনিরা কাকা’—আম্বাজে ঢিল মেরেই তার গালদুটো লাল হয়ে উঠল ।

‘না, না, কোন আশ্বাস নয় । এমন একজন যার সম্পর্কে তুমি পাগল ।’
স্বরার চক্ৰ ছানাবড়া । হঠাৎ লাফিয়ে উঠে মায়ের গলা জড়িয়ে উৎসাহে
ফেটে পড়ল, ‘সত্যি ? সত্যি বলছো মা ?’

‘ছাড় ! ছাড় !’—হাসতে হাসতে মা মেয়েকে ঠেলে, দূরে সরিয়ে দেয় ।
‘একবারে দুষ্টু মেয়ে ! দাঁড়া, সব আমি ওনাকে বলবো ।’

‘মা, মা, ক্রিমস্কি ? এসেছেন ? বাবা আনতে গেছেন ? জিনা
কাকিমাও ? যে কোন মূহুর্তে তারা হাজির হবেন...মা, মা, আমার ছাই-
রং-এর পোষাকটা পরব ! উঃ, তারা আসছেন ! এখানেই আসছেন !
উত্তেজিত ও উদ্ভাসিত হয়ে মায়ের চেয়ারের চারপাশে সে লাফাতে শুরু করল,
ছুটে গেল আলনার সামনে ; মূহুর্তের মধ্যে পোষাক পালটাতে হবে ভেবে
যখন শুনল সদর দরজা বন্ধ, আবার আলনার সামনে ফিরে চলে আসতো
আজুল বুলিয়ে ধীরে চেয়ারে বসে চোখ বুজে হঠাৎ-উজ্জ্বলনা দমন করার
চেষ্টা করতে লাগল । নয়ন-ব্দগল খুলবে, ক্রিমস্কিকে দেখতে পাবে এই
ঘরের মধ্যে, হাতখানেক তফাতে, চেয়ারে উপবিষ্ট ! যে-কবির কবিতা পড়ে
পড়ে সে পাগল, যাকে তার জিমনাস্টিক ক্লাবের সবাই মনে করে আধুনিক
কালের প্রের্তকবি । কি শান্ত, ধনিব্যাজক, স্নেহস্পর্শ, মধুর কবিতা !
ভগবান ! এইমূহুর্তে তিনি সশরীরে উপস্থিত হবেন, স্বরার বানিষ্ট হয়ে

কসবেন, কথা কসবেন, পাঠ করবেন এমন কবিতার লাইন বা সন্ধ্যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। জিমনাস্টিক রুমের মেয়েরা কেউ তা শোনার সুযোগ পাননি। আগামীকাল গবে' সে তাদের কাছে বলবে, 'ক্রিমস্টিক বা লিখেছেন, তোমাদের পড়া উচিত।'

'কোন লেখা?' তারা জিজ্ঞেস করলেই, সুরা আলকের কবিতাগুলো আবৃত্তি করে শোনাবে। স্বভাবতই তারা যখন জানতে চাইবে কোথায় সে এগুলো পেল, সুরা বুক ফুলিয়ে—বেশ বুক ফুলিয়ে জবাব দেবে যে কোথাও ছাপা হয়নি এখনো...গতকালই ক্রিমস্টিক শব্দে সুরাদের বাড়ি খাবার-টেবিলে তার সামনে আবৃত্তি করেছিলেন। কি রকম বিস্মিত হবে ওরা! হিংসের জ্বলবে! ঐ প্যাচালো বৃষ্টির কিংকিনা—মুখে কামা ঘেবে দেয়া যাবে। ওকে শিক্ষা দেয়া যাবে বোনকে-শেখাতে-আসা কোন গায়িকার চেয়ে কোন কবির সঙ্গে পরিচয় থাকা কত উৎসবের। তারা জিজ্ঞেস করবে, 'সুরা, আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দে না।' এবং—আচ্ছা, উনি যদি সহসা ওর প্রেমে পড়ে যায়? এটা অসম্ভব কিছ নর কারণ তিনি কবি। সচরাচর কবির প্রেমের ব্যাপারে বেশ দুর্বল।

আচ্ছা, কি ধরনের গেম রাখেন তিনি? তাঁর চোখজোড়া? নিশ্চয়ই, আরত এবং বিষম। আঁখিপন্নবে রাতি জাগরণের কালচে ছাপ। নাকটিও নিশ্চয়ই টিকোলো, ছোট। গেমটি নিশ্চয়ই কৃষ্ণবর্ণ হবে। তার সামনে হাত কচলে, হাটুগেড়ে বলবে, 'সুরা! সুরা! তোমাকে দেখাশুই, 'জীবনের নতুন উষার উষর হলো, ফসলে কাঁপন তোলে আশার আলো।...এলে শৃঙ্গু তুমি, তুমিই এলে। শপথ করি, ফসল তোমার চিনতে ঠিকই পেলো।' বাঃ, এ লাইনগুলোতো কবিতায় উনি লিখেই ফেলেছেন। তা'লে...

'দমচাপা, ধূলো, তার উপর বীভৎস একটা গন্ধ—সারারাত মশাই ঘুমোতে পারিনি'—কথাবার্তার আওয়াজে সুরা শব্দলোকের বিচরণ ভঙ্গ করে বাস্তবের সন্ধিতে ফিরে এল। কঠিনবরে যদিও উচ্চব্যক্তির কর্ণ ও স্বেচ্ছাচারীতার সুর ছিল, সুরার কানে লাগল কোমল ও আকর্ষণীয়। চোখ খুলে উঠে দাঁড়ালেই দেখতে পেল কালো ডেলভেটের জ্যাকেট, হৃদয় রংয়ের প্যান্ট পরিহিত বীর্ষকর একজন পুরুষ সুরার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

‘শুভদিন, ভদ্রমহিলারা ! আমাকে ভুলেই গেছেন, তাই না ?’

‘আমি !’ —সুন্না বিধাচিত্তে বলে উঠলো, ‘আপনার কবিতা আমি সর্বদাই পাঠ করি, অবিশ্য শেষবার যখন এ বাড়ি এসেছিলেন, অনেক ছোট ছিলাম আমি ।’ ‘এখনতো বেশ ভারি কিছু লাগছে,’ তিব্বক দৃষ্টিতে এক বলক দেখেই উনি হাসতে হাসতে বলে উঠলেন । আরও কিছু বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলেন ।

যেমন বয়স্ক ব্যক্তির করে থাকেন ; চেরারে দেহটি এলিয়ে দিতে দিতে সুন্নার বাবাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘বাঃ, তোমার দ্বয়টি বেশ খোলা-মেলা, আরামদায়ক, মিখাইল ।’

নভমস্তকে নখ খঁটেতে খঁটেতে সুন্না চকচকে প্লেটে কবির হাসিহাসি মূখ্যটির প্রতিফলন দেখতে পেল । কবির হৃদয় রংয়ের প্যাস্ট, লোম-ছাটা মাথা এবং সন্ধ্যা লাল গোঁফটি সুন্নার ঠিক মনে ধরল না । উঃ, কি নিরস ! ছন্দহীন ! এমনকি চাঁছা নীল গাল, ধূতনি এবং ঠোঁট নাড়াবার ভঙ্গিটি পৰ্ব্বন্ত ! চোখজোড়া অত্যন্ত সাধারণ, যে কেউ বলবে প্রাণহীন ; পাভাগুলো যেন খুলে পড়তে চায় । কপালটা বলিরেখায় ঠাসা । বলতে কি, সুন্নার দেখা বিভিন্ন ডাকঘরের সাধারণ এক কেরাগীর মত লাগছে ওনাকে । তাঁর হাব-ভাব চেহারায় ছিঁটেফোঁটাও কবিত্বভাব নেই । হাতজোড়া ? সুন্না চোরা চাউনি দেয় । মনে হয় বেতোরগীর মতো স্থূল, আঙ্গুলগুলিও বেঁটে, মোটা । একটি আঙ্গুলে আবার দামী পাথরের আংটি পরেছেন । বিষাদে সুন্না দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ।

‘তুমি তা’লে আমরা কবিতার পাঠিকা ?’

কবি সুন্নার উদ্দেশ্যে বললেন । সম্মতি জানিয়ে সুন্না রক্তিম হয়ে ওঠে ।

‘খুব ভাল ! কথা হচ্ছে, তোমার কি ভাল লাগে ?’

‘বলতে ! আপনার লেখা নিয়ে ওরা সব পাগল’—মা জবাব দিলেন ।

‘বাঃ, এ আপনি চাটুকারিতা করছেন ।’

‘মোটাই না, মিথ্যে কথা !’ —মায়ের কথার প্রতিবাদ করল সুন্না, কিন্তু কবির কথার পৃষ্ঠে অর্ধটা দাঁড়াল উল্টো ।

খুব লজ্জা লাগছে সুরার, এ পরিস্থিতিতে নিজেকে বোকা বোকা ঠেকছে : মা, বাবা, কাকা এবং উনি—প্রত্যেকেই হাসছেন। কি একটা কারণে উনি চোখ তুললেন, সমস্ত মৃদুতার মনে হল ভাড়ামির ছাপ। উনি অমনভাবে ভদ্রবৃন্দা তুললেন কেন ? সবার সঙ্গে এত হাসিমুখেরাই বা কি দরকার। তিনি তো একজন কবি, অত্যন্ত অন্তর্ভুক্তিশীল এবং বুদ্ধিমান হওয়া উচিত ওনার। সুরার এই লজ্জা পাওয়ার উনি কি মজা পাচ্ছেন ? অন্যান্যরা যেমন পায় ? উনি দশটা মানুষের মতো অতি সাধারণ ? সম্ভবতঃ ও প্রথমদিকে উনি সবার সঙ্গে খাপখাওয়াতে চেষ্টা করছেন, পরেই ওনার ব্যবহারে স্বকীয়তা ফুটে উঠবে।

‘কোন ক্লাসে পড়, সুরা ?

‘ক্লাস সিলে।’

এ কথা জানতে চাইলেন কেন উনি ? সুরা নাম ধরেই বা ডাকলেন কেন ? ‘কোন শিক্ষকমশাইকে তুমি বেশি পছন্দ করো ? মনে হচ্ছে, আকার মাস্টারমশাই ?’

‘না, সাহিত্যের।’

‘আচ্ছা, আচ্ছা, সাহিত্যের শিক্ষক,’—চাপা হাসির রোল উঠল। মনে হলো সুরা টুকরো টুকরো হয়ে বিকৃত হচ্ছে, কে যেন দেহের মধ্যে ফড়িগে দিচ্ছে হাজার হাজার আল্পিন। এই মৃদুতের, টেবিল পরিত্যাগ করে নিষ্কৃতি পেতে চাইল সে। খুব নিরাসক্ত লাগছে, মনে হয় আর সে চোখের জল ঠেকিয়ে রাখতে পারবেনা। এভাবে নিজেকে মেলে ধরল কেন সে ? আত্ম-ভিমানের কাঁপতে কাঁপতে সে কবির দিকে তাকালো। চোখজোড়ার ক্রোধ ও চিন্তাচঞ্চলতার এক অদ্ভুত মিশ্রণ। ভয় হচ্ছিল, সব কথাগুলো বলার আগেই সাহসের বর্ধিষ্ণু তার ভেঙ্গে পড়বে ; তাই টেবিলটি আঁকড়ে এক নিঃশ্বাসে শব্দ করলো, ‘উত্তরটা কি খুবই ছেলোমানুষী মনে হলো আপনার কাছে ? কিন্তু কথাটা খুবই সত্য। স্কুলের প্রেস্ট শিক্ষক বলে আমরা তাঁকে ভালোবাসি, প্রাণ দিয়ে। তিনি, বলতে পারেন আশ্চর্য স্বপ্নর করে, পাড়ায় শোনান সব রকমের বই, সাহিত্যের যেকোন নতুন দিক তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেন। সর্বদা মিলিয়ে, উনি অত্যন্ত ভালো মানুষ। আপনি যাকে

খুব জিজ্ঞেস করতে পারেন, জানাবের জন্য কি উচ্চ, প্রশ্ন, সবাই এক কথা
বলবে। আপনাদের হাতির কারখানা কি জানতে পারি? অবশ্য, আমি...'

'সুখা? কি হয়েছে তোমার?' বাবা গভীর আগ্রহে মিলেন।

'আমরা ছোট মহিলাটিকে আঘাত দিয়েছি'—দীর্ঘকণ্ঠে ক্রিমিক বলে
উঠলেন, 'আমি কমা চেরে নিচ্ছি।'

তার কমা চাইবার ধরনটি সুরার কানে ককশভাবে বাজল। মনে হলো
কথামূল্যের মধ্যে আঘাত আত্মরিকতা নেই এবং সুরার কি মনে হতে পারে
সে ব্যাপারে মোটেই চিন্তিত নন। উপরন্তু, এ পরিস্থিতিতে নিজেকে অনাহত
মনে হচ্ছে, কেউ যেন তার উপস্থিতি কাম্য মনে করছে না। আত্মমানিতে,
খাওয়ার টেবিলে সে বসে রইল। দ্বন্দ্ব ভারাক্রান্ত হলো কদম্ব বেধনার।

'এই তা'লে উনি! আবার কবি! আর দশটা মানুষের সঙ্গে কোন
প্রভেদ নেই'—খাওয়ার পর নিজের ঘরের জানালায় বসে ভাবতে শুরু করল
সে। জানালার ওপাশই তার প্রিয় লাইলাকের কোণ, বাগান। এমন-
ভাবে দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, জীবনে এই প্রথম যেন দর্শন-মুগ্ধ হচ্ছে।

'দশটা সাধারণ মানুষের মতো! কিন্তু কেন, তা'লে বাবাও কবিতা
লেখেন না কেন? উনি কি কবির চেয়ে কোন অংশে নিকট?'—কবির
কিছু কবিতার লাইন মনে এলো তার। কি ঐকান্তিক! কি উদ্দীপক!
কি বেধনাবিদ্যুর কোমল ছন্দের ছটা! "খেতে খেতে একবারও তিনি সে
ভাবার কথা বললেন না। তিনি শব্দ কলম দিয়ে লিখতেই অভ্যস্ত, যেমন
সোনিয়া, সাজাকোভা কাগজ দিয়ে ফুল বানাতে যন্ত্রের মতো অভ্যস্ত হয়ে
গেছে। সাধারণ মানুষ তার এ ক্ষমতার হিংসে করে কিন্তু উনি হেসে বলেন,
'এ আর এমন কি! খুব সোজা'।"

বাগান থেকে কিছু কথাবার্তার আগ্রহে ভেসে এল। বাবা এবং ক্রিমিক
আছেন ওখানে। লাইলাক কোণটার ঠিক পেছনের বেঞ্চটার যদি ওনারা
বসেন, সুরা সব কথাই শুনতে পাবে। ঘাড়টা বাকিয়ে সে দেখতে থাকে
কোথার বসেন ওনারা।

'নতুন বইটা কেমন বিক্রী হচ্ছে তোমার?'—বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

'খারাপ না। বিভিন্ন মন্ত্রণের কথা ভাবছি আমি। কিন্তু লোকগুলো

কৌতূহলে বসে বিনেছে, ততটা কবিতাকে ভালবেসে নয়। বইটা ঘেরোনের সঙ্গে সঙ্গে হতভাগা সমালোচকগুলো অপসংস্কৃতি, অপসংস্কৃতি বলে চিৎকারে শুরু করেছে। আর লোকগুলোরও মুড়মুড়ি লাগছে ঘোঁষে অপসংস্কৃতিটা কি বস্তু! এ শব্দটা নিয়ে অনেক চ্যাটামোচি হয়েছে বার কোন মানেই হয় না। বাক, আছেরে লাভ হলো আমারই। হুড়হুড় করে বইটা কেটে গেল।

ক্রিমিকর কণ্ঠে দৃষ্টিস্তার ছাপ, তবুও প্রতিটি কথার ফুটে উঠছিল ক্রোধ। জানলার বসে সুরার অন্তরে কথাগুলো প্রতিধ্বনি তুলছিল।

‘হ্যাঁ’—বাবা বললেন, ‘সমালোচকরা তো লেখকদের উপর ২৬শ হস্ত।’

‘ওদের কথা হচ্ছে কবিরা সাধারণ মানুষের ক্রোধ ও আতর্নাদের কাব্যিক রূপ দেবে। নিজস্ব জগতে বসে তারা ভাবে মানুষের শব্দ ক্রোধ আর আতর্নাই আছে। জঘন্য! ওরকম মানুষ আমরা তো জীবনে দেখিনা। সাধারণ মানুষ বলতে তো কিছু মর্ষ আর কিছু আত্মস্বার্থী, এর বাইরে কি আছে? আমাদের সমালোচক মশাইদের এ বিষয়টি মগজে ঢোকে না। তারা শব্দ বইয়ের ধুলোই ঘাটে, জীবনের সঙ্গে যোগ নেই। নেই কোন ঐতিহ্য বা নতুন চিন্তার সঙ্গে পরিচয়। তরুণেরা? ‘তরুণেরা আজকাল অকালবৃদ্ধ হয়েই জন্মায়, বৃদ্ধ’—কে যেন বলেছিল কথাটা। খুবই সত্যকথা। কাব্য-টাব্য ওদের বোকার বিষয় নয় এমন কি আত্মার শব্দের ব্যাপারেও ওগুলো নিরেট। বাক, এ প্রসঙ্গ থাক্...তোমার মেয়েটি কিন্তু ভারী সুন্দর!’

‘ও তো জন্ম থেকেই কবি! বোধহয় লক্ষ্য করেছে ব্যাপারটা?’

‘ওনাকে ধন্যবাদ!’—আপন মনে ফিসফিস করে সুরা আনন্দে পলকিত হয়ে উঠল। ওনার কথাবার্তা থেকে সিদ্ধান্ত করল অহেতুক সে ওনার বিরুদ্ধে মনে মনে অভিযোগ করেছিল, ঠিক বুদ্ধিতে পারেনি ওনাকে। পুনরায় সুরার কম্পনার উনি একজন যথার্থ কবি হয়ে উঠলেন। তখনই বাগান থেকে জেসে এসে প্রশংসার বাক্য।

‘হ্যাঁ, ভালো কথা, অশোভন হলে ক্ষমা করো, তোমার সেই...’

‘আমার সেই স্ত্রীর খবর? জানিনা কোথায় আছে এখন। বছর দুয়েক আগে শুনিয়েছিলাম ককেশাস অঞ্চলের কোন এক স্থলে মাসটারি করে। উঃ, ওর

কথা ভাবাই পারে কাগদনি করে। জগতে কিছু কিছু মেরেছেলে আছে
 বাবের গৃহ বা মধ্যমিতে উদ্ভীষ্ট হওয়া তো ঘরের কথা, শিউরে উঠতে
 হয়। ওর সান্নিধ্যে মনে হোত যথার্থই আমি একজন ভীত হয়ে উঠছি,
 যেন আমি একজন পাপী। ওর আসল স্বরূপ আবিষ্কারের পর, আমার
 জন্য আমি জীবনে এমন অনুকম্পা বোধ করিনি। মনে হোত
 অহেতুক কোন ঐশ্টানের আত্মা কষ্ট পাচ্ছে। বিরক্তিকর একঘেঁয়ে!
 বলিছিলাম, আমাদের জন্য চা আসবে কখন?’

‘এই এলো বলে! কিন্তু যেটা আমি জানতে চাচ্ছি তা হলো—তুমি কি
 ফের বিয়ে করেছ, না অবিবাহিত?’

‘অবিবাহিত, সেই মে মাস থেকেই। সারা শীতকালটা আমি এক
 রূপসীর সঙ্গে কাটলাম। বদলে বন্ধু, সে এক দারুণ ব্যাপার! মেরেটি
 আমার গৃহমুখা; দেখতে ঠিক এক টুকরো আগুন, শিক্কা-বীক্ষাও আছে;
 তা হলেও মেরেটিছিল জড়বুদ্ধিসম্পন্ন। আমাদের পরস্পরের পরিচয়
 নিছকই দুর্ঘটনা—অন্তত আমার তরফে কোন পরিকল্পনা ছিল না। ঘটনাটা
 ঘটেছিল একটা পিকনিকে; বেশ খানিকটা টেনে মৌজে ছিলাম আমি।
 শরতানই জানে কি করে সে আমার ক্যাটে চলে এল। সন্ধ্যা থেকে
 উঠে চোখ মদুতে মদুতে ভাবছি, সেকি! আমি বিবাহিত। নিজেকে
 ধন্যবাদ জানিয়ে, পোষাক পরে পরবর্তী ঘটনার জন্য অপেক্ষা করতে
 লাগলাম।’

বাবা হো হো করে হেসে উঠলেন। স্ত্রীর মনে হোল হাসিটা অন্তর
 বিদীর্ণ করে দিয়ে গেল। ভরানক আঘাত পেল সে।

‘বলতে চাচ্ছ সাক্ষাৎ বিষয় ? তারপর?’

‘হ্যাঁ, মেরেটি ঘুম থেকে উঠল। দেখলাম তার চোখে জল; তারপর
 বা হয়, চন্দনের বন্যা বইয়ে অনেক কিছু শপথ করলাম তার কাছে।
 সপ্তাহখানেক ধরে পরিপূর্ণ ভবে থাকার পর, আমার ক্লান্তি এসে গেল।’

‘মেরেটার বাবা-মা ছিলোনা?’

‘তাদের কথা সম্পূর্ণ চেপে গেছল। তারপর, ধীরে ধীরে, স্বাভাবিক
 জীবন শুরু হতেই, ঝামেলার আরম্ভ। শরতানই জানে কেন। প্রথমতই

মেরেটা প্রদান করতে চাইল আমার সন্ধ্যা, কোমল স্বপ্ন-লালিত কবিতার সঙ্গে আমার জেনিগাউনটির কোন মিল নেই। বলব কি তোমার বার্ট রুবল দিয়ে কিনেছিলাম ওটি। প্রতিবাদ করতেই, ক্যাচ ক্যাচ করে কানতে শব্দ করল। সে এক দৃশ্য কটে। শ্বিতীয়ত, তার দ্যান-ধারণার কবি হলো এমন এক স্বর্গীয় সৃষ্টি যার ব্যাঙিতে কোন আত্মার জায়গা থাকা উচিত নয়। অন্যের কথা বাদ দিলাম, মনের দিক দিয়ে বিচার করলে কবির কাছে অন্য কবিতাও তো আত্মা দ্বিতে আসবে। উঃ, কোন শয়তান বে আমাদের মেরেদের এ সব উদ্ভট চিন্তা ক্রেসে দিয়েছে। এর পরই বিবাদ, কাম্বাকাটি, সন্তান চেয়ে গিফ-বামি হওয়ার জন্য দ্যানদ্যানানি—সব কিছু চেয়ে দাবি আর দাবি। শেষকালে, পালিয়ে এসে চিঠিতে কয়েকটা লাইন লিখলাম, ‘এ সব কিছুর উপর কোন কবির আগে দরকার স্বাধীনতা’।”

‘বেশ, তার পরের ঘটনা?’—বাবা মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

‘মাসে মাসে ছাব্বিশ রুবল পাঠিয়ে দিই।’

হুয়ার সমস্ত অনদ্ভূতি শীতল, স্নায়ুগুলো কাঁপছে; উদ্বাসদৃষ্টিতে জানালা দিয়ে তাকিরে রইল সে।

‘তাই তোমার ইদানিং লেখাগুলো নৈরাশ্যে ভরা!’

‘তুমি কি আমার এ বইটা পড়েছ, ‘বহুবর্ণ’ স্মৃতির পোষাক রাত্রির অন্ধকারে বিদীর্ণ হয়ে যার?’

‘বাবা!’

‘ও বইটাতে আমি এই বিদ্রী় কাহিনীটার স্মৃতি বর্ণনা করেছি।’

‘স্বপ্নের বর্ণনা হয়েছে’—বাবার দীর্ঘশ্বাস উঠল, ‘তুমিতো, সবদাই বর্ণনার রাজা। সেই যে লাইনটা, ‘আবেগের অস্পষ্ট নকশার মালা’।”

‘দেখছি, শব্দ খুঁটিয়েই আমার বই পড় তুমি।’

‘তা ঠিকই। সামনে বলে চাটুকোরি করছিনা, সত্যিই তোমার কবিতা আনন্দ দেয়।’

‘কন্যাবাদ। এ প্রশংসা তো বেশি শুনতে পাইনা, বন্ধুও সত্যি বলতে কি, আমি আমি এ প্রশংসার বোধ্য।’

‘নিঃসন্দেহে, বন্দু! চলো চা পান করা যাক।’

‘একটু লক্ষ্য করো আধুনিক কবি এবং কবিতার উপর ; মান্দুখগুলো তেও কবি নয়, এক একটি শকুন। ভাষাকে ওরা খর্বণ করছে, গলিরে-পাচিরে দিচ্ছে। বরং আমি যার নিম্নে চেষ্টা করছি...’

সুঁরা লক্ষ্য করল বাবা এবং কবি পরস্পর কোমর জড়িয়ে পাশাপাশি বাগানটা পেরিয়ে যাচ্ছে। ক্রমে তাদের কথাবার্তাগুলো অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে গেল।

‘সুঁরা সোজা উঠে দাঁড়াল। মনে হচ্ছে ভারী কিছু বস্তু তাকে চেপে রাখতে চাচ্ছে, নড়তে দিচ্ছে না।

‘সুঁরা, এস চা তৈরী’—মায়ের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। উঠে ঘরজার দিকে এগিয়ে গেল সে। আলনার চোখ পরতেই দেখল, তার মুখটা ফ্যাকাশে, লম্বা এবং ভীত। অগ্রবাস্পে চোখবুটো ঝাপসা। খাওয়ার-ঘরে ঢুকতে মনে হলো পরিচিত মুখগুলো অবয়বহীন, অস্পষ্ট সাধা সাধা কিছু বিম্বদ।

‘আশা করি তরুণীটি আর আমাদের উপর রাগ পোষণ করছে না’—কবির কণ্ঠ শোনা গেল।

সুঁরা জবাব দিল না। তার লোম-ছাঁটা মাথাটার দিকে তাকিয়ে শ্মরণ করতে চেষ্টা করল, যখন প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিলনা নিছক কবিতা পড়ে মান্দুখটার সম্পর্কে কি কল্পনার স্বর্গ তৈরী করেছিল।

‘সুঁরা, কথার জবাব দিচ্ছনা যে ? এ কি অভদ্রতা হচ্ছে !’ বাবা, চোঁচিরে উঠলেন। সুঁরার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ল। চীৎকার করে বল’লা, ‘কি চাও, কি চাও তোমরা আমার কাছে ? একা থাকতে দাও আমার। যতসব ভন্ড !’ ফোঁপাতে ফোঁপাতে, রান্নাঘর থেকে সে ছুটে বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে আবার সে প্রল্যাপের মতো বকে উঠল, ‘ভন্ড ! ভন্ড !’

বেশ কিছু সময়, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে টোঁকলের চার ব্যক্তি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। আশ্বে মা এবং কাকীমা উঠে গেলে, বাবা কবিকে জিজ্ঞাস করলেন, ‘বাগানের কথাবার্তা ও কি কিছু শুনেন ফেলেছে ?’

‘বাবা দাও তো !’ বিতীয়জন অস্থিরভাবে চেয়ার নাড়িয়ে, বিরক্তিতে হুঁড়ে মারল কথাগুলো।

মা ফিরে এল।

হৃদয়ের জিজ্ঞাসা দৃষ্টির সামনে কবিটা সামান্য কাঁকিয়ে উত্তর দিল, ‘ও কবিছে !’

আমরা ছাত্রজন ও একটি মেয়ে

আমরা ছাত্রজন লোক, ছাত্রশতা জীবন্ত মেশিন—একটা বিরাট বাড়ির মাটির তলার নোংরা, অশুকার কুঠুরির মধ্যে আবদ্ধ থাকি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ময়দা ডোলা, মচমচে নিমকি-বিস্কুট ও নোনতা বিস্কুট বানানো আমাদের কাজ। নীচের তলার জানালা দিয়ে ইট-গাথা নোংরা কুঠুরিটা দেখা যায়—দেয়ালটা চটচটে সবুজ হয়ে গেছে। কুঠুরির জানালাগুলোয় ঘন করে শিক বসানো, আর তার কাচ ভেঙ করে সূর্যের আলো কখনই আমাদের এই ঘরে ঢুকতে পারে না—কাচগুলোতে অস্বচ্ছ কিছ, একটা মাখানো। মালিক জানালাগুলো এমনভাবে ঘিরে দিয়েছে যাতে ঘর থেকে বিস্কুট কোন ভিখিরি বা ভবঘুরে, আমাদের বেকার কোন বন্ধুর হাতে গিয়ে না পৌঁছতে পারে। মালিক আমাদের ডাকে একদল জোচ্চোর বলে, আর রাতের খাবার হিসেবে বরাদ্দ মাংসের নামে নোংরা নাড়িভড়ি।

কালি-ঝুল ও মাকড়সার জালে ভরা নীচ ছাদের নীচে এই আবদ্ধ কারাকান্ডটির ভেতরে জীবন আমাদের অতিষ্ঠ। নোংরা দাগ ও শ্যাওলা ভরা ঐ পদু, বেয়ালের মধ্যে বেঁচে থাকা বড়ই কষ্টকর, ক্লান্তিকর। ভোর পাঁচটার ঘুম থেকে উঠতে হয়। যথেষ্ট ঘুম না হওয়ায় তখনও মাথা ভারী হয়ে থাকে। এবং ছটার সময় নিঃপ্রাণ জড় পদার্থের মতো আমরা টেবিলে বসে মাথা-ময়দা থেকে মচমচে নিমকি-বিস্কুট ও সস্তা বিস্কুট বানাতে শুরুর করে দেই। আমরা যখন ঘুমোই আমাদের কিছ, সহকর্মী তখন ময়দা মেখে রাখে। ভোর থেকে রাত দশটা, এই সূর্যাস্ত সময় ধরে আমাদের কেউ কেউ টেবিলে বসে শস্ত ময়দার ডোলা থেকে বিস্কুট বানায় আর ধুলে ধুলে শরীরের জড়তা কাটায়। অন্যেরা ময়দা ও জল মেশায়। নিমকি-বিস্কুটের ময়দা সেখ-করা-গামলা থেকে সারাদিন ফুটন্ত জলের সোঁ সোঁ শব্দ ওঠে—শব্দটাকেমন অদ্ভুত বিষম। বিস্কুট যে ভাজে সে বেলচা করে সেখ পিচ্ছিল ময়দার টুকরোগুলো রুক্ষ ও দ্রুতবেগে গরম ইটের মধ্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয়, ফলে ঠুঁঠাং শব্দ ওঠে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ছুরীতে কাঠ জরুল।

আগুনের লাল আভা যেন নীরব বিদ্রুপে ঘরের বেজরালে তিকরে পড়ে। বিশাল চুল্লীটাকে মনে হয় কোন অশ্রুত দৈত্যর মাথা মাটি ফর্দে উঠেছে। তার হা-করা মুখের মধ্যে জ্বলছে লকলকে আগুন। আমাদের দিকে তপ্ত নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সে তার কপালের উপর হুটো বাতাস নেবার গর্ত থেকে আমাদের এই বিরামহীন পরিগ্রহ দেখে। ঐ গর্তহুটোকে দেখে মনে হয়—সেই দৈত্যর নির্ভর নির্বিকার হুটো চোখ। ঐ চোখ হুটো আমাদের মত গোলামদের অশ্রুত হৃদয়ে দেখতে দেখতে ক্লান্ত। এই গোলামগুলোর কাছে মানবিক কোন কিছুই আশা করা যায় না। ঐ চোখহুটো যেন অধিকতর জ্ঞানের নির্বিকার অজ্ঞা নিয়ে আমাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে।

এই উত্তপ্ত শ্বাসরোধকারী ঘরে ময়দার গুঁড়ো ও রাস্তা থেকে পায়ে পায়ে বয়ে আনা কালিহুঁলির মধ্যে আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ময়দা ডাল ও নির্মকি-বিস্কুট বানাই। নির্মকি-বিস্কুটে আমাদের শরীরের ঘাম ঝরে পড়ে। আমরা আমাদের এই কাজকে ভীষণ ঘৃণা করি। নিজহাতে যা বানাই, তা কখনও খাই না। এর চেয়ে পোড়া ঘাসের হুঁটিও ভাল লাগে। একটা লম্বা চৌবলের দু'পাশে ন'জন করে মৃত্যুমুখি বসে ঘন্টার পর ঘন্টা অত্যন্ত যান্ত্রিকভাবে আমরা হাত ও আঙ্গুলের কাজ করে যাই। এত অভ্যাস হয়ে গেছে যে কে কি করছি সেদিকে আর কেউ লক্ষ্য করি না। আর একে অপরকে এত ভালভাবে চিনে ফেলোছি যে প্রত্যেকেই সহকর্মীদের মুখের প্রতিটি ভাঁজ পর্যন্ত জানি। কথা বলার মতো আমাদের আর কোন বিষয় নেই, তাই সারাক্ষণ নীরব থাকি। আমরা এতই অভ্যস্ত। শুধু মাঝে মাঝে অভিশাপ দিই—কারণ সব সময়ই কোন লোককে, বিশেষ করে নিজের বন্ধুকে অভিশাপ দেবার কিছু না কিছু থাকেই। অবশ্য আমরা একে অপরকে খুব একটা অভিশাপ দিই না। কেউ অর্ধমৃত হয়ে গেলে, পাথরের মর্তির মত জড়পদার্থে পরিণত হলে, হাড়ভাঙ্গা খাটুনির চাপে কারো অন্তর্ভুক্তিহীন ভোতা হয়ে গেলে তাকে কি দোষারোপ করা যায়? যাদের সব কথা শেষ, নীরবতা তাদেরই কাছে বেদনাদায়ক, ক্লান্তিকর; কিন্তু যাদের কথা এখনও অনন্ত রয়ে গেছে, তাদের কাছে নীরবতা স্বাভাবিক ও সহজ।

মহাভারতে আমরা গান গাই, কিন্তু সেই গান আসে এইভাবে : কান্ন
করতে করতে কেউ হঠাৎ হঠাৎ রাত বোড়ার মত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে,
তারপর গুনগুন করে একটা দীর্ঘ টানা সুরে গান গাইতে আরম্ভ করে ।
সে গানের বিবাকপূর্ণ কোমল সুর গায়কের হৃদয়ের ভারী বোকা হালকা
করে দেয় । কোন একজন গান গায়, আর বাকীরা নীরবে নিঃসঙ্গ গানটি
শোনে । এবং শরতের ভেজা রাত, উষ্ম প্রান্তরে, প্রজ্বলিত আগুনের শিখা
যেমন পৃথিবীর উপরে সীসার ছাঘের মতো ছেয়ে থাকে ধূসর আকাশের
নীচে ধীরে ধীরে নিভে আসে, তেমনি সেই গান এই পীড়াপীড়ক অশ্ব
প্রকোপের ছাঘের নীচে ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যায় । তারপর আর একজন
গায়ক প্রথম সুরের সাথে সুর মেলায় এবং বৃট্টো কণ্ঠস্বর এই বিজি ধরে
শ্বাসরোধকারী উত্তাপের মধ্যে মধুর কোমলভাবে ভেসে বেড়ায় ।
তারপর হঠাৎ বেশ কয়েকটা কণ্ঠস্বর তার সাথে যোগ দেয়—সেই গান যেন
তরঙ্গের মতো আছড়ে পড়ে এবং বলিষ্ঠ ও তীব্রতর হয়ে মনে হয় আমাদের
এই কারাগারের সীমান্তসেতে ভারী দেয়ালগুলো ভেঙে চুরমার করে দেবে ।

তারপর ছাশ্বজনিই গাইতে শুরু করে ; বহুদিনের অভ্যাসে গড়ে
ওঠা এক্যতানে উচ্চ কণ্ঠস্বরগুলো সমস্ত কারখানাটা ভরে দেয় ; এ গান
মুদ্রিত বেদনা প্রকাশ করে ; পাথরের দেয়ালে মাথা ঠোকে, গোলাব,
কাঁদে এবং হৃদয়ের মধ্যে একটি সুক বাথার মোচড় আনে, পুরনো
কতগুলোকে প্রকাশ করে এবং বৃকের ভেতরে ক্রোধের জন্ম দেয় । গায়কেরা
গভীর দীর্ঘশ্বাস নেয় ; কোন একজন হঠাৎ থেমে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে
কণ্ঠস্বরের গান শোনে, তারপর আবার সেই সাধারণ বোধসংগীতে গলা মিলিয়ে
দেয় । অন্য কোন একজন চোখ বৃজে গান গাইতে গাইতে হতাশার সুরে
চিৎকার করে বলে ওঠে, “আ !” হঠাৎ বা, সে শব্দের এই প্রশস্ত তুফানকেই
মনে করে দরগামী কোন পথ, সূর্যের আলোর কলমল করা কোন উষ্ম
পথ, যে পথ দিয়ে সে হেঁটে চলেছে...

রাত্রীর মধ্যে আগুনের শিখা তখনও নেচে যায় । যে বিস্কুট ভাঁজছে
তার বেগুলা তখনও ইটের উপর শব্দ করে, ডেক্‌চিতে জল তখনও টগবগ করে
ছুটে চলে, দেয়ালের গারে লাল আগুনের আভা তখনও নীরব হাসিতে

কাঁপতে থাকে। আর বে-গরনের বাণী আমাদের সৃষ্টি নয়, সেই গরনের কথার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের ভেতরকার ভৌতা বেদনা, সুখের আগো থেকে বঞ্চিত জীবন্ত মানবের যন্ত্রণাময় বেদনা, গোলামের বেদনাকে প্রকাশ করি। আর এইভাবেই আমরা বেঁচে আছি, আমরা হাসিমুখজন লোক একটা বিশাল পাথরের বাড়ির মাটির তলার এক অশ্বকারাচ্ছন্ন বস্তু হয়ে বেঁচে আছি, এবং এখানে জীবনের বোঝা এত ভারী, মনে হয় এই বাড়ির তিনটি তলা যেন আমাদেরই কঁধের উপরে গড়ে উঠেছে।

গান ছাড়াও একটা জিনিস আছে যাকে আমরা ভালবাসি ও যাকে নিয়ে আনন্দ করি। এমন একটা কিছ্, যা সম্ভবতঃ আমাদের না-পাওয়া সুবালোকের স্থান পূরণ করে। আমাদের বাড়িটার ঘোড়ালার একটা জরী-এমরয়ডারীর কারখানা আছে। অনেক মেয়ে কাজ করে সেখানে, আর তাদের কাঁইফরমাল খাটে বোল বছরের একটি মেয়ে তানিয়া। প্রতিদিন সকালে আমাদের কারখানার দরজার ছোট জানালার কাচের উপর একটি খুশী-উজ্জ্বল নীল চোখের গোলাপী মূখ এসে লাগে এবং মিস্ট রিগরিণে কঠম্বর আমাদের ডেকে বলে :

‘ওগো জেলব্দুদরা ! কই কিছ্, নিমকি-বিস্কুট বাও !’

আমরা সকলে সেই উজ্জ্বল কঠম্বরে সচকিত হই এবং সেই নিম্পাপ শিশুসুলভ মুখের দিকে কোমল ও খুশির ভাসিতে তাকাই—আঃ আমাদের দিকে কি মিস্টি হাসি ছড়ায় ঐ মূখ ! আমরা কাচে-চেস্টে-থাকা নাক, এবং হাস্যময় গোলাপী ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা ছোট ছোট চকচকে সাদা দাঁতগুলো দেখতে বড় ভালবাসি। পরস্পরকে ধাক্কাধাক্কি করে আমরা দরজা খুলতে ছুটে বাই, সে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। কি প্রাণবন্ত ও স্নিগ্ধ। এ্যাপ্রনটাকে বদ্বহাতে তুলে ধরে, ঘাড়টাকে সামান্য কাত করে উজ্জ্বল মূখে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে সে। তার বাদ্যমী চুলের একটা মোটা বেশী কঁধের উপর দিয়ে বৃকের পরে কুলছে। মেঝে থেকে চোকটি চার খাল উপরে—কালিকুলি মাথা, শূকনো, কুঁসিত আমরা মাথা উঁচু করে তাকে দেখি ও সুপ্রভাত জানাই। তাকে স্বাগত জানানোর ভাষা একটি বিশেষ ভাষা, কেবল তারই জন্য আমরা এই ভাষা বেছে নিয়েছি।

তার সাথে কথা বলার সময় আমাদের মূর কোমল হয়ে যায়, ঠাট্টা হয় হাস্যকর মেজাজের। তার জন্য আমাদের সব কিছুই যেন বিশেষ ধরনের। যে কিছুটা ভাজে সে চুরী থেকে এক বেগটা মচমচে ভাজা লাল কিছুটা বার করে খুব দক্ষতার সঙ্গে তানিয়ার এ্যাপ্রনের উপর ঢেলে দেয়।

‘দেখো, মালিক যেন দেখতে না পায়!’ আমরা সাবধান করে দিই। সে খিলখিল করে হেসে খুশীতে চিংকার করে বলে ওঠে :

‘চলি গো জেলঘরুরা!’ তারপর খুঁজে ইঁদুরের মতো চোখের নিমেষে উধাও হয়ে যায়।

ব্যাস, এ টুকুই...। কিন্তু সে চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ ধরে আমরা তাকে নিয়ে আলোচনা করি—কাল যা বলেছি এবং পরশু যা বলেছিলাম সেই একই কথা আলোচনা করি, কারণ সে, আমরা এবং আমাদের পারিপার্শ্বিক সবই কাল যেমন ছিল, পরশু যেমন ছিল, ঠিক তেমনই আছে। চারপাশের কোন কিছুই পরিবর্তন না ঘটলে বেঁচে থাকার খুবই বেঘনাবায়ক ও কঠিন হয়ে পড়ে। যদি এর ফলে তার আত্মার মৃত্যু না ঘটে, তবে বহু বেশী দিন সে বেঁচে থাকে, চতুর্পার্শ্বের জিনিসগুলোর অপরিবর্তন তত বেশী বেঘনাবায়ক হয়ে ওঠে। আমরা সবসময় মেয়েদের নিয়ে এমনভাবে আলোচনা করি যে মাঝে মাঝে আমরা নিজেকে উপরেই, নিজেকে শুল নিলজ্জ কথাবার্তার উপরেই বিরক্ত হয়ে উঠি। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ যেসব মেয়েদের আমরা চিনি তাদের নিয়ে মার্জিত রুচিতে কথা বলার কোন মানেই হয় না। কিন্তু তানিয়াকে নিয়ে কখনও শুল আলোচনা করি নি। আমাদের মধ্যে কেউ তাকে স্পর্শ করার কথা ভাবেনা এবং সেও কখনো আমাদের কাছ থেকে কোন শুল ইয়াকি শোনে নি। সম্ভবতঃ তার কারণ হচ্ছে, সে কখনও বেশী সময়ের জন্য থাকেনি—আকাশ থেকে তারা খসে পড়ার মতো আমাদের দৃষ্টিপটে ধরা পড়েই উধাও হয়ে যায়। অথবা তার কারণ এও হতে পারে যে সে খুব ছোট ও স্নেহময়। এবং যা স্নেহময় তা মানুষের, এমনকি লম্পট ও শুলরুচির মানুষেরও প্রাণ জাগ্রত করে। যদিও নিরলস একঘোঁসে খাটুনি আমাদের বোঁবা বাড়ি পরিণত করেছে, কিন্তু আমরা এখনও মানুষ।

আর কলচী মানুষের মতো আমরাও কোন আরাধ্য বস্তু ছাড়া বঁচতে পারি না। সেই বাড়িতে এক উজনের মতো ভাড়াটে থাকা সত্ত্বেও, মাটির তলার অন্ধকারাচ্ছন্ন এই বন্ধনকে অবস্থানকারী মানুষগুলোর চারপাশে তানিমার চেয়ে বেশী স্বন্দর আর কিছু নেই, আর কেউ আমাদের দিকে তাকায়ও না। সর্বোপরি, সম্ভবতঃ এটাই মূল কারণ যে আমরা মনে করি সে আমাদেরই। তার অন্তিম বেঁচে আছে আমাদেরই ভৈরী বিস্কুটের উপরে। তাকে গরম বিস্কুট দেওয়াটা আমরা নিজেকেই কর্তব্য করে নিয়েছি। সেই দেবী প্রতিমার কাছে এটা আমাদের দৈনিক অর্ঘ্য, প্রায় একটা পবিত্র ধর্মোচার। ফলে সেও প্রতাহ বেশী বেশী করে আমাদের আপন হয়ে গেছে। গরম বিস্কুট ছাড়াও আমরা তানিমাকে অনেক রকম উপদেশ দেই—সে যেন গরম জামা-কাপড় পরে, সিঁড়ি বেয়ে খুব ছুটে না ওঠে, খুব ভারী জ্বালানী কাঠের বোকা না নেয়। সে হাসতে হাসতে আমাদের উপদেশ শোনে, হাসি মুখেই প্রত্যুত্তর দেয়, আর কখনও সেই উপদেশ মানে না। কিন্তু আমরা সে জন্য রাগ করি না—তার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছি এতেই আমরা তৃপ্ত।

প্রায়ই সে আমাদেরকে তার কাজ করে দিতে বলে। যেমন, সে যখন একটা অদ্ভুত গর্বভরে আমাদের কোন গৃহামের দরজা খুলে দিতে বা কাঠ কেটে দিতে বলে, আমরা সানন্দে সেই কাজ করে দিই।

কিন্তু আমাদের কেউ যখন তার সবে-খন-নীলমণি জামাটির কোন অংশ সেলাই করে দেবার জন্য অনুরোধ করল, সে ঘৃণায় নাক সিঁটকে বলে, ‘আহা কি কথা! ও বাবা আমি পারব না!’

আমরা ঐ বোকা বস্তুটাকে নিয়ে খুব হাসাহাসি করলাম এবং আর কখনও তাকে কোন কাজ করার কথা বলি না। আমরা তাকে ভালবাসি, আর এটাই একমাত্র কথা। মানুষ সব সময়ই তার ভালবাসার পাঠ খুঁজে বেড়ায়, যদিও তা প্রায়শই অত্যাচারে পরিণত হয়, তার জীবন নোংরা ও বিষাক্ত করে তোলে, কারণ ভালবাসার সময়ে মানুষ তার ভালবাসার পাঠকে গ্রহণ করে না। তানিমাকে আমাদের ভালবাসতেই হবে। ও ছাড়া ভালবাসার মতো আমাদের আর কেউ নেই।

কখন সখনও আমাদের মধ্যে কেউ তর্ক জুড়ে দেয়, ‘এ’ রকম একটা

ছোট্ট ছোট্টে নিয়ে আবেশলাপনা করার মানে কি ? ওর মধ্যে কি এমন আত্মবিশ্বাস আছে শুন ?

এককম কথা বে বলে তাকে আমরা কঠোর ভাবার খামিরে দিই—আমাদের অবশ্যই ভালবাসবার মতো কিছু একটা থাকতে হবে ; আমরা তা পেরেছি, তাকে ভালও বেসেছি, এবং আমরা ছাখিগজন বা ভালবেসেছি তা আমাদের প্রত্যেকের, সবচেয়ে পবিত্র জিনিস । যে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে সে আমাদের শত্রু । আমরা যা ভালবেসেছি হয়ত তা ভাল না হতে পারে, কিন্তু যেহেতু আমরা ছাখিগজনই এর সাথে জড়িত, আমরা চাই অন্যরাও আমাদের প্রিয় বস্তুটিকে পবিত্র করে রাখবে ।

আমাদের ভালবাসা ঘৃণার চেয়ে কম কষ্টদায়ক নয়...এবং সম্ভবতঃ সেই কারণেই কিছু গোপ্য লোক ঘাবি করে বলে যে ভালবাসার চেয়ে আমাদের ঘৃণা বেশী চাটুক্যরিতাপূর্ণ । তাই যদি হবে তবে তারা আমাদের এড়িয়ে চলে না কেন ?

বিশ্কুট ছাড়াও মালিকের একটা বানরুটির কারখানা আছে । সেটা এই বাড়িতেই এবং একটিমাত্র দেয়াল সেটাকে আমাদের এই ঘিঞ্জির থেকে পৃথক করে রেখেছে । অবশ্য বানরুটির কারিগরেরা সংখ্যায় মাত্র চারজন হলেও, নিজেদেরকে আমাদের থেকে পৃথক করে রাখে । মনে করে তারা আমাদের চেয়ে পরিষ্কার কাজ করে এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত জীব ; তারা কখনও আমাদের কারখানায় আসে না এবং যদি উঠানে তাদের কারো সংগে আমাদের হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, তারা বিম্বপসূচক ঘৃণা প্রকাশ করে । আমরাও তাদের কারখানায় বাই না—মালিক এই ভরে আমাদের ওখানে বাওয়া নিবিশ্ব করে দিয়েছে পাছে আমরা বানরুটি ছুরি করি । বানরুটির কারিগরদের আমরাও ঘৃণা করি, কারণ আমরা ওদের প্রতি ঈর্ষান্বিত । আমাদের চেয়ে ওদের কাজ হালকা, ওরা বেশী মাইনা পায়, ভাল খাবার পায়, ওদের কারখানা বেশ খোলামেলা—হাওয়া খেলে, এবং ওরা সকলেই বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যবান । সেই কারণেই তারা এত বেশী ঘৃণ্য । অপর দিকে আমরা সকলেই পান্ডুর প্যাঁচামুখো, আমাদের মধ্যে তিনজনের সিফিলিস রোগ আছে, কারো কারো চুলকানি, একজন'ও ব্যতীত বিকলাঙ্গ । ছুটির দিন বা রবিবারে তারা সড়ট ও

মন্ডলে উঁহু বৃত্ত জুড়ো পরে, তারের দু'জনের এ্যাকরডিয়ান আছে, এবং তারা সকলে মিলে পার্কে বেড়ানত বার। আর আমরা সোংরা ছেঁড়া জামাকাপড় পরি, পারে থাকে ছেঁড়া কোঁসরের জুড়ো, আর পদাংশও আমাদের পার্কে চুকতে ঘের না—সুতরাং আমরা কি এই সব বানরুটির কারিগরদের পছন্দ করতে পারি ?

একদিন শুনলাম যে ওদের প্রধান কারিগর মদ খেয়ে মাতলাম করেছে এবং মালিক তাকে খুব গালাগাল করে বললে অন্য একজন লোক নিয়োগ করেছে। সেই নতুন কারিগরটা আগে সৈনিক ছিল। সে স্যাটিনের ওয়েস্ট-কোট পরে এবং তার সোনার চেনের একটা বড়ি আছে। সেই ফুলবাড়টিকে দেখবার জন্য আমরা খুব উৎসুক হয়ে গেলাম। তাকে দেখবার আশায় একের পর এক ঘন ঘন উঠানে ঘোরাফেরা করতে লাগলাম।

কিন্তু সে নিজেই আমাদের কারখানার চলে এল। লাধি ঘিরে বরজা খুলে বরজার গোড়ায় ঝাঁড়াল, হেসে সম্ভাষণ করল : 'কি খবর ! খোকনরা সব কেমন চলছে ?'

দু'মায়িত মেঘের মত মিহি তুষার-বাতাস বরজা ঘিরে ঢুকে তার পায়ের কাছে কুন্ডলি পাকাতে লাগল, আর সে নীচে আমাদের ঘিকে তাকিয়ে বরজার কাছে বঁড়িয়ে রইল। গর্বোন্মত্ত গোঁফের তলা থেকে তার বড় বড় হলুদ দাঁত চকচক করতে লাগল। তার ওয়েস্টকোটটা সতাই চমৎকার—নীল, তার উপরে এমব্রয়ডারী করা ফুলগুলো চকচক করেছে এবং বোতামগুলো এক ধরনের লাল পাথরের তৈরী। চেনটাও আছে।

সৈনিকটা সত্যিই খুব সুন্দর দেখতে—লম্বা, গাট্টাগোট্টা চেহারা, গালটা লাল টকটকে এবং বেশ বড় হালকা রংয়ের চোখজোড়ায় দৃষ্টিও খুব সুন্দর—কেশ স্নেহভরা, ঘন দৃষ্টি। মাথায় আছে কড়া-মাড়-দেওয়া সাধা টুপি, এবং টানটান এ্যাপ্রনের তলা থেকে অভ্যস্ত চকচকে কেতাবুরন্ত জুতোর ছাঁচলো মাথা উঁকি মারছে।

আমাদের প্রধান কারিগর তাকে মোলায়েম ভদ্রতার বরজাটা বন্ধ করতে বলল। অভ্যস্ত ধীরে বরজাটা বন্ধ করে সে মালিক সম্পর্কে আমাদের প্রশ্ন করতে লাগল। আমরা একজনের কথার উপরে আর একজন বলতে লাগলাম

যে, মালিকটি হচ্ছে একটা হাড়-কিপটে, বজর, বদমাশ এবং অভ্যাচারী—
মালিক সম্পর্কে আমরা বা বা বললাম তা সব সম্ভবতঃ এখানে লেখা যায় না।
গোঁফে তা দিয়ে পরিষ্কার মার্জিত দাঁতি দিয়ে আমাদের সম্মান দেখিয়ে
সৈনিকটা সব শব্দে লাগল।

‘তোমাদের এখানে অনেক মেয়ে আছে দেখছি’, হঠাৎ সে বলে উঠল।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভয়ভাবে হেসে উঠল, অন্যরা প্রসন্ন মুখ
করে চেয়ে রইল এবং কোন একজন তাকে জানিয়ে দিল যে এখানে অনেক
ডপ্কা তুলতুলে সুন্দরী আছে।

‘ভোগ-টোগ চলে?’ সৈন্যটা চোখ মেলে স্পষ্ট ইঙ্গিতে পাশটা প্রশ্ন
করে।

আবার আমরা হেসে উঠলাম, এবার একটু নরম করে, বিব্রত ভঙ্গীতে,
আমাদের মধ্যে অনেকেরই সৈনিকটির মনে এই বিশ্বাস অর্জন করানোর ইচ্ছে
হল যে, তার মত আমরাও খোস মেজাজী, কিন্তু তারা তা করতে পারল না।
আমাদের মধ্যে কেউ তা করল না। কেউ একজন ধীরে এইটুকু শুধু বলল,

‘ওরা আমাদের জন্য নয়...’

সৈন্যটি আমাদের দিকে চোখ কঁচকে বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সাথে বলল,
‘নাঃ। তোমরা দেখছি অনেক পেছনে পড়ে আছ। কোন কাজের লোক
নও...। খাঁটি চরিত্র বলতে কিছু নেই...। আসল জিনিসটা কি
জানো? আসল জিনিস হচ্ছে চোখের চাউনী। মেয়েছেলেরা পুরুষের
চোখের চাউনীকে সবচেয়ে বেশী পছন্দ করে। মোটামুটি শরীর দেখাও...
দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। আর হ্যাঁ, অবশ্য সে কিছুটা ছ’্যাচা শরীর
পছন্দ করে। আর পছন্দ করে ডানার মত ডানা—এরকম!’

সৈন্যটা পেকেটে গোঁজা ডান হাতটা বার ক’রে কনুই অবধি হাতটা
গুটিয়ে নেয়, এবং আমাদের দেখবার জন্য পেশী তুলে ধরে। হাতটা শক্ত ও
সাধা, চকচকে সোনালী চলে ভরা।

‘পা, বুক, সমস্ত কিছুই শক্ত থাকতে হবে। বুঝলে হে, তারপর তোমার
পোষাক, সেটাও ঠিক ঠিক থাকা চাই—একবার কিটকাট। এই ধর আমরাই
কথা—মেয়েরা হুমড়ি খেয়ে আমার উপর এসে পড়ে। তা বলে ভেয়ানা,

আমি তাদের পেছনে ছুটি বা তাদের উস্‌কানি দিই—তারা এমনই এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে—এক একবারে পট্‌জন করে।’

একটা ময়দার বস্তার উপরে বসে সন্ধ্যারে বলে, মেয়েরা তাকে কেমন করে ভালবাসে, তাদেরকে নিয়ে সে কি তৎপরতার সাথে চলে। তারপর তার প্রশ্নান ঘটে। সমস্তে ধরজা বন্ধ হয়ে গেলে আমরা দীর্ঘ সময় ধরে নীরবে বসে থাকি। তার কথা ও কাহিনীর কথা ভাবি। তারপর হঠাৎই সবাই একসাথে কথা বলতে শুরু করে দেই। আলোচনার প্রকাশ পায় যে আমাদের সকলেরই তাকে খুব ভাল লেগে গেছে। কি সুন্দর, সরল একটা লোক, সে কিভাবে ভেতরে এল, বসল এবং গম্প করল, এইসব নিয়ে আমরা আলোচনা করি। এর আগে কখনও কেউ আমাদের সাথে দেখা করতে আসে নি, কেউ আমাদের সাথে এরকম বন্ধুর মতো কথা বলে নি। আমরা নতুন কারিগরটিকে জড়িয়ে সেই দরজা মেয়েগুলো সম্পর্কে আলোচনা শুরু করে দিলাম খারা উঠানে হয় মৃদু ভেৎচে ধরে চলে যায়, না হয় আমাদের উপস্থিতিতেই উপেক্ষা করে সোজা হাটা লাগায়। আমাদের বিশ্বাস ভবিষ্যতে এ লোকটা ওসব দজ্জালদের জয় করবে। যখন সেইসব মেয়েরা শীতকালে পশমের কোট ও সুন্দর ছোট টুপি পরে, এবং গরমকালে ফুলতোলা টুপি ও উজ্জ্বল রংয়ের ছাতা মাথায় দিয়ে উঠানে, আমাদের জানালার পাশ দিয়ে যেত আমরা তাদের কেবল প্রশংসাই করতাম। অবশ্য তাদের নিয়ে আমাদের মধ্যে এমনসব আলোচনা করতাম, কানে গেলে ওরা লজ্জা ও ঘৃণার পাগল হয়ে যেত।

‘আশা করি সে কখনও আমাদের তানিয়ার দিকে যাবে না।’ আমাদের প্রধান কারিগর হঠাৎ উদ্বেগের স্বরে কথাটা বলে ফেলল।

এই কথায় আমরা সবাই হতবাক হয়ে গেলাম। তানিয়ার কথা ভুলেই গেছিলাম—সৈনিকটা যেন তার বিশাল সুন্দর চেহারা নিয়ে আমাদের মন থেকে তানিয়ার কথাটা মুছে ফেলেছিল। আমাদের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেল। কেউ কেউ বলল যে তানিয়াকে সে কিছুতেই টলাতে পারবে না, কেউ কেউ বলল তানিয়া সৈনিকটার আকর্ষণ ঠেকাতে পারবে না, এবং অন্যরা প্রস্তাব করল ব্যাটা যদি তানিয়ার দিকে এগোতে চায়, মেয়ে ওর

হাউসফুল করে দেওয়া হবে। অবশেষে সকলে ঠিক করল যে সৈন্যটা ও তানিয়ার উপর নজর রাখা হবে, এবং মেরেটিকে ওর সম্পর্কে সন্ধান করে দেওয়া হবে। ওখানেই তর্কাতর্কির অবসান হ'ল।

প্রায় একঘাস কেটে গেল। সৈনিকটা দুটি সেক, বরজি মেরেদের সাথে বাইরে যায়, প্রায়ই আমাদের সাথে দেখা করতে ঘরে আসে, কিন্তু কখনই তার অধিকার সম্পর্কে কোন কথা বলে না—কেবল গৌর পাকার ও ঠেট চাটে।

তানিয়া প্রতি সকালে কিছুটা নিতে আসে এবং আগের মতোই সে আনন্দোচ্ছল, মিষ্টি ও ভদ্র। আমরা তার সাথে সৈন্যটার ব্যাপারে কথা বলতে চেষ্টা করি—সে লোকটাকে 'ডাবা চোখের পুতুল' এবং অন্যান্য অশ্লীল বিশেষণ দেয়, এবং আমরা খুশিই হই। বরজি মেরেগুলো সৈন্যটার সাথে অষ্ঠাঃ মতো লেগে থাকায় আমরা আমাদের ছোট্ট মেরেটির জন্য গর্ব বোধ করি। লোকটার প্রতি তানিয়ার বিরূপ মনোভাব আমাদের খুব উৎফুল্ল করে তোলে, তারই প্রভাবে আমরা সৈন্যটাকে ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করি। আমরা তানিয়াকে আগের চেয়েও বেশী ভালবাসতে শুরু করি এবং প্রতি সকালে তাকে বেশী বেশী আনন্দোচ্ছ্বাস ও ঘর ঘরে সন্ধ্যানা জানাই।

বাহোক, একদিন সৈন্যটা মাতাল হয়ে টলতে টলতে আমাদের সাথে দেখা করতে এল। কসে পড়ে হাসতে শুরু করল। যখন জিজ্ঞাস করলাম হাসছে কেন, সে বলতে আরম্ভ করল :

'লিডা ও গুশা আমাকে নিয়ে মারামারি করেছে। নিজেরাই নিজেরদের সাথে চলাচল করেছে। ও সে কি হিসহিসানি। হাঃ হাঃ ! একজন আর একজনের চুলের মৃদু ধরে মাটিতে টানতে টানতে ঐ গলিটার ভেতর নিয়ে গিয়ে বকে চেপে বসেছে। হাঃ—হাঃ—হাঃ ! একজন আর একজনের মূখ অঁচড়ে জামা ছিঁড়ে ফেলেছে। আমি কি হাসলাম ! এই সব জ্ঞানি মাথাগুলো সরসরি লড়াই করতে পারে না কেন ? ওরা অঁচড়ায় কেন, ব্যা ?'

সে বেড়ের উপর কসে—তাকে কি পারিকার, স্নান্যবান ও হাসিখুশী

বোঝাচ্ছে—কি বিরামহীন হাসছে ! আমরা কিছ্ বললাম না । যে কারণেই হোক এখন তাকে দেখে আমাদের ধৃণা হচ্ছে ।

‘মেয়েছেলের বিষয়ে আমার ভাগ্য এত ভাল কেন বলতো ? সত্যিকারের হিসাঁহিসানি ! কেন । আমি একবার শূন্য চোখ মারব আর কেমনা ফতে !’

চকচকে লোমশ সাবা হাতটা সে উপরে তুলল এবং নামিয়ে হাঁটুর উপরে চাপড় মারল । সে আমাদের দিকে একটা খুশীভরা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকাল, যেন মহিলাদের ব্যাপারে নিজের সৌভাগ্যে সত্যিকারের বিস্ময় বোধ করছে । একটি নির্মল আনন্দে তার গোলগাল লাল মূখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আর ঠোঁটের উপর দ্বিভ বোলাতে লাগল ।

আমাদের প্রধান কারিগর ক্রুদ্ধভাবে বেলচাটা ছন্নীর ভেতর ঢুকিয়ে, হঠাৎ ব্যঙ্গের স্বরে বলে উঠল :

‘নিছক ফার গাছ ফেলার কোন মজা নেই—পাইন গাছ নিয়ে কি কর দেখতে ইচ্ছে করে !’

‘কি, কি বললে ? আমরা কিছ্ বলছ ?’ সৈন্যটা প্রশ্ন করল ।

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমাকে ।’

‘তুমি কি বলছ কি ?’

‘কিছ্ মনে করো না... । যা বলছি থাক ।’

‘এই দাঁড়াও দাঁড়াও । তুমি কি নিয়ে বলছ বলতো ? পাইন গাছ বলতে কি বোঝায় ?’

আমাদের কারিগর উত্তর দিল না । তার বেলচা সৈন্য করা বিস্কুটগুলো কড়াইরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল এবং ভাজা বিস্কুটগুলো মেঝের ফেলে দিল । সেখানে ছেলেরা স্নাতোর গাঁথছে । সে যেন সৈন্যটার কথা ভুলে গেছে । কিন্তু সৈন্যটা হঠাৎ ক্ষেপে উঠল । দাঁড়িয়ে কড়াইরের কাছে গেল, বেলচার হাতলটা উঁচুতে লাফিয়ে উঠে একটু হলেই তার বকে আঘাত করত ।

‘শোন,—কি বলতে চাও ? এটা রীতিমত অপমান । কেননা, এখানে এমন কোন মেয়ে নেই যে আমার হাত ফসকাত্তে পারে । না, দাবা এমন কেউ নেই ! আর তুমি কিনা আমার সাথে মস্করা করছ ?’

মনে হল সে সত্যিই আহত হয়েছে। এ কথা ঠিক তার আত্মসম্মানের মূল উৎসেই হচ্ছে মেয়ে শিকারের ক্ষমতা; সম্ভবতঃ এই একটিমাত্র মানবিক গুণ নিয়েই সে অহংকার করতে পারে, এবং এই একটিমাত্র জিনিসের জন্যই সে মনে করে সে একজন পুরুষ।

এমন লোক আছে যাদের কাছে জীবনের আসল বিষয়ই হচ্ছে দেখ বা মনের বিকৃতি। এ সবই তাদের জীবনকে ঘিরে রাখে, এর জন্যই তারা বেঁচে থাকে। এই বিকৃতির জন্য কষ্ট ভোগ করলেও এর ব্যারাই তারা নিজেদের তৃপ্তি সাধন করে। লোককে তারা এ বিষয়ে নালিশ জানায়, এ ভাবেই তাদের সহগামীদের চিন্তাকর্ষণ করে, লোকের কাছ থেকে সহানুভূতির মাশুল আদায় করে, আর জীবনে তাদের এই একটিমাত্র জিনিসই আছে। সেই বিকৃতি থেকে বঞ্চিত করলে, স্তম্ভ করে তুললে তাদের জীবন হয়ে উঠবে একান্তই দুর্বিবহ, কারণ জীবনের মূল উদ্দেশ্যটাই হারিয়ে তারা শূন্য খোলসে পরিণত হবে। কখনও সখনও মানুষের জীবন এতই হুঁতভাগ্য হয়ে পড়ে যে পাপকর্মে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়, তাকে অকিঞ্চিৎ পড়ে থাকে। কেউ হয়ত বলবেন, মানুষ প্রচণ্ড এক-ঘেরেমির মধ্যে থেকেই পাপকর্মে আসক্ত হয়ে পড়ে।

সৈন্যটির যেন মর্মে হুল বিঁধেছে। সে আমাদের কারিগরের সামনে গিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করে বলতে লাগল :

‘না, তুমি বল—কে সে?’

‘বলব, বলছ?’ কারিগর হঠাৎ তার দিকে ঘুরে বলল।

‘হ্যা!’

‘তুমি তানিলাকে চেন?’

‘আচ্ছা?’

‘হ্যা, হ্যা তার কথাই বলছি! ওকে কি করতে পার দেখব।’

‘আমি?’

‘হ্যা, হ্যা, তুমি।’

‘ওকে? অতি সহজে, তুরি মেয়ে!’

‘আমরা দেখতে চাই।’

‘দেখতে চাও ! হ্যা হ্যা !’

‘কেন, সে তো—’

‘এক মাসও সময় লাগবে না !’

‘তোমার খুব দস্ত, তাই না সৈনিক ?’

‘ঠিক আছে, তবে পনেরো দিন ! আমি তোমাঘের দেখাব ! কার কথা বললে ? তানিয়া ? ফু ?’

‘ঠিক আছে, তুমি যাও । লেগে পড় !’

‘মাত্র পনেরো দিন, তারপরই দেখবে কাজ ফতে ! বদলে হে !’

‘বেরিয়ে যাও !’

কারিগর হঠাৎ রেগে উঠে তার বেলচাটা উঁচিয়ে ধরল । সৈন্যটা বিস্ময়ে পিছিয়ে এল, তারপর নীরবে কিছুক্ষণ আমাদের দিকে মূখ ফিরিয়ে দাঁত কড়মড়িয়ে বলে উঠল, ‘ঠিক আছে !’ তারপর বেরিয়ে গেল ।

গভীর আগ্রহে, নীরবে এই লড়াইটা শুনছিলাম । কিন্তু সৈনিকটি চলে যেতেই আমরা সবাই চিৎকার করে উত্তেজিত বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়লাম ।

কে যেন একজন কারিগরকে চিৎকার করে বলে উঠল :

‘প্যাভেল, তুমি একটা বাজে জিনিসের সূত্রপাত ঘটালে !’

‘নিজের কাজ কর !’ কারিগর ধমক দিয়ে উঠল ।

আমরা বদ্বতে পারলাম যে সৈন্যটির অহংকারে যা লেগেছে এবং তানিয়া বিপদে পড়বে । এবং এটা জানা থাকা সত্ত্বেও আমরা সকলেই কি হয় জানবার একটা তীব্র আনন্দধারক কোতূহলের বশবর্তী হয়ে পড়লাম । তানিয়া কি সৈন্যটির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে ? আমরা প্রায় বিনা প্রতিবাদে এই প্রত্যয় উচ্চারণ করলাম :

‘তানিয়া ? অবশ্যই জিতবে ! সে অত সস্তা নয়, তাকে নিয়ে খেলা অত সোজা নয় ।’

আমাদের আরাধ্য দেবীকে এই পরীক্ষায় নামাবার জন্য ভয়ঙ্কর উৎকীর্ণ হয়ে উঠলাম । পরস্পরকে আশ্রয় বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে আমাদের দেবীমূর্তি অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং সে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেই । উল্টে, আমরা এও আলোচনা করতে লাগলাম যে আমরা সৈন্যটিকে যথেষ্ট ভাড়াতে

পেরেছি কি না—কারণ আমাদের ভয় হল যে সে হয়ত এই বাজির কথা
 জুলে যাবে, তাই তার আশ্ব-অহঙ্কারে আরও কিছু খেঁচা লাগতে হবে ।
 এখন থেকে একটা নতুন উদ্বেজক উৎসাহ আমাদের জীবনে বৃদ্ধ হল, এ এমন
 একটা জিনিস যার ম্যাদ আমরা আগে কখনই পাই নি । বেশ কয়েকদিন
 ধরে আমরা নিজেকে মধ্যে তর্কাতর্কি করলাম ; আমরা সবাই কিভাবে যেন
 বেশ চালাক হয়ে উঠেছি, ভাল ভাল কথা বেশী বেশী করে বলতে লাগলাম ।
 আমরা যেন শয়তানের সাথে একটা খেলায় মেতেছি, আমাদের লড়ায়ের সম্বল
 হচ্ছে তানিয়া । যখন বান রুটির কারিগরের কাছ থেকে জানতে পারলাম
 যে তাদের সৈনিকটি ‘তানিয়ার জন্য মরণযাত্রা শুরুর করেছে’, আমাদের
 উদ্বেজনা চরম সীমায় উঠে গেল । উদ্বেজনাময় অভিজ্ঞতায় জীবন এমন
 ভয়পূর্ণ হয়ে উঠল যে লক্ষ্যই করলাম না কোন ফাকে মালিক এই
 সুযোগে আমাদের ঘিরে প্রতিদিন অতিরিক্ত চোন্দ্র দলা ময়দার কাজ করিয়ে
 নিচ্ছে । আমাদের কাছে আর ক্লান্তিও আসছে না । সারাদিনই মূখে
 তানিয়ার নাম ধরে বেড়ায় । একটা অশ্রুত অধৈর্য নিয়ে আমরা সকালে তার
 আসার অপেক্ষায় থাকি । মাঝে মাঝে মনে হয় কোন একদিন আমাদের
 কাছে এলে দেখব যে এক অন্য তানিয়া এসেছে, এ যেন সেই তানিয়া নয় যাকে
 আমরা সব সময় জানতাম ।

অবশ্য, আমরা ঐ বাজি সম্পর্কে তাকে কিছু বলিনি ।

তাকে কখনও কোন প্রশ্ন করি নি বরং একই স্নেহভরা ভাল
 ব্যবহার করেছি । কিন্তু আমাদের মনোভাবের মধ্যে যেন নতুন কিছু একটা
 প্রবেশ করেছে, যা তানিয়া সম্পর্কে আমাদের পূর্বের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ
 পৃথক—আর নতুন উপাদানটি হচ্ছে অব্যাকৌতুহল, এমন কৌতুহল যা
 ইম্পাতের ফলার মতো তীক্ষ্ণ ও শীতল ।

‘খোকারা ! আজ শেষ দিন !’ কোন এক সকালে কারিগর কাজ শুরুর
 করে বলল ।

মনে না করিয়ে দিলেও আমরা খুব ভালভাবেই তা জানতাম । তবুও
 সবাই চমকে উঠলাম ।

‘তোমরা তানিয়াকে লক্ষ্য রেখো । ও এখনি ভেতরে আসবে,’ কারিগর

পরামর্শ দিল। কে যেন অনুভূতের সাথে বলে উঠল :

‘এ জিনিস চোখে দেখে বোঝা যায় না।’

এবং আবার একটা ছোট তর্কাতর্কি শব্দ হয়ে গেল। আজকে, অবশেষে আমরা জানতে পারব যে-পাত্রে আমরা আমাদের অন্তরের সর্বোৎকৃষ্ট বস্তুটি কিংবাস করে রেখেছি সেটা কতখানি পবিত্র, নিন্দনীয়। এই প্রথম একটি সকাল আমাদের সামনে আসছে যখন আমরা সর্বোচ্চ পণ দিয়ে জুরো খেলাছি, যখন আরাধ্য দেবীমূর্তির পরীক্ষা আমাদের ভরাডুবি ঘটাতে পারে। এতদিন শব্দে আসছি যে সৈনিকটি তানিয়ার কাছে টানবার প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে, কিন্তু যেকোন কারণেই হোক আমরা কেউ তানিয়ারে তার সম্বন্ধে প্রশ্ন করি নি। সে বরাবরের মতোই প্রতি সকালে আমাদের কাছে বিস্কুট নিতে এসেছে এবং সব সময়েই নিজের মতোই ছিল।

সে দিনও আমরা তার কঠোর শব্দে পেলাম :

‘কিগো, জেল ঘর ঘুরা। আমি এসেছি...।’

তাড়াতাড়ি তাকে ভেতরে ঢুকতে দিলাম এবং যখন সে ভেতরে এল, বিপরীত পৃথিবীতে তাকে স্বাগত জানালাম--সেটা হল নীরবতা। আমরা তার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালাম এবং বুঝতে পারলাম না কি বলব, কি জিজ্ঞেস করব। তার সামনে দাঁড়িয়ে একদল নির্বাক, গোমরামখো লোক। এই অস্বাভাবিক সম্বন্ধনা পেয়ে সে অবশ্যই অস্বস্তি হয়ে গেল, এবং হঠাৎ দেখলাম সে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে, তাকে অস্থির দেখাচ্ছে। ধরা গলায় সে প্রশ্ন করল :

‘তোমরা সবাই আজ এত...অস্থিত কেন?’

‘তোমার খবর কি?’ কারিগর তার মূখের উপরে দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে গভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

‘আমার আবার কি খবর?’

‘না কিছু না।’

‘ঠিক আছে, বিস্কুট দাও, জলদি।’

আগে কখনও সে তাড়া দেখায় নি।

‘অনেক সময় আছে,’ কারিগর স্থির দৃষ্টিতে উত্তর দিল।

হঠাৎই সে ঘুরে ঘুরকা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

কারিগর তার বেলাচা তুলে নিয়ে চুন্নীর দিকে ঘুরে শান্তভাবে বলল :

‘হা, সে ধরা দিয়েছে। সৈন্যটা, শন্নতানটা জয় করেছে।’

আমরা ভেড়ার পালের মত পরস্পরকে গর্তো মারতে মারতে টলতে টলতে
টোঁকলে ফিরে গিয়ে বসে পড়লাম এবং নীরবে উদাসভাবে কাজ শুরূ
করে দিলাম। কোন একজন তখন বলে উঠল :

‘সে ধরা নাও দিতে ...।’

‘চুপ কর। অনেক হয়েছে!’ কারিগর চিংকার করে উঠল।

সবাই জানি সে বুদ্ধিমান, আমাদের সকলের চেয়ে বেশী
বুদ্ধিমান। তার চিংকারই আমাদের বলে দিল যে সৈনিকের বিজয়
সম্পর্কে সে নিশ্চিত। আমরা বিষন্ন ও হতবিস্বল বোধ করতে লাগলাম।

বারোটার সময়—মধ্যাহ্নভোজের সময়—সৈনিকটি ভেতরে এল। সে
বরাবরের মতোই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ফিটফাট, এবং আগের মতোই
সোজাসুজি আমাদের মুখের দিকে তাকাল। তার দিকে তাকাতে আমরা
খুবই অস্বস্তি বোধ করছি।

‘কিগো, মহাশয়েরা, দেখতে চাও একজন সৈনিক কি করতে পারে ?
সবাই ঐ সরু পথটার গিয়ে দাঁড়াও, দেয়ালের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারো।
যুদ্ধে আমার কথা?’ সে গর্বভরে কথা কটা বলল।

আমরা দল বেঁধে সরু পথটার গিয়ে দাঁড়ালাম। একে অপরের
উপরে ঠাসাঠাসি কাঠের দেয়ালের একটা ফাঁকের মধ্যে আমাদের মুখগুলো
চেপে ধরে উঠোনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে
হ’ল না। দেখলাম তানিয়া দ্রুত পাল্লে, উঁকি দিয়ে গলা বরফ ও
কাধা-ভরা গর্তের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠোনটা পার হয়ে গুদাম
ঘরের দরজার ভেতরে ঢুকে মিলিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে সৈনিকটিও শিস
দিয়ে অলসভাবে ঘোরাঘুরি করতে করতে সেখানে ঢুকে গেল। হাত দুটো
তার পকেটে ঢোকান আর গোম্বিজোড়া নাচছে।

বৃষ্টি পড়ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি গর্তটার বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে
বুদ্ধিমান উঠছে। কিনটা ভেজা খসর, অত্যন্ত বিষন্ন। ছাড়ে এখনও তুষার

পড়ে আছে, মাটিটা ধকধকে কাষায় ভরা। ছাষের ওপরের বরফও খরেরী
 স্রবের ধুলোর ধসারিত। এই পথটার ধাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা খুব অস্বস্তিকর
 এবং ঠান্ডাও খুব বেশী।

ঐ গুম্বাস ঘর থেকে প্রথমে বেরিয়ে এল সৈনিকটি। পকেটে দুটো হাত
 ঢুকিয়ে, গোঁফ নাচাতে নাচাতে, সে তার অভ্যাস মতোই অলসভাবে উঠোনটা
 পার হয়ে গেল।

তারপর বেরিয়ে এল তানিয়া। তার চোখজোড়া...তার চোখজোড়া
 আনন্দ ও খুশীতে উজ্জ্বল, আর ঠোঁটে রয়েছে হাসি। আর সে যেন
 স্বপ্নের ভেতর দিয়ে হেঁটে চলেছে, অসংলগ্ন পা ফেলে, দুলে দুলে...

আমাদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। হঠাৎ সবাই ধাক্কাধাক্কি করে
 ধরজা দিয়ে উঠানে বেরিয়ে এলাম এবং ভয়ংকর, সুউচ্চ, আদিম গর্জনের
 মতো আমরা তার দিকে চিংকার করে উঠলাম, শিস দিতে শুরু করলাম।

আমাদের দেখেই সে চমকে উঠল এবং স্থির হয়ে ধাঁড়িয়ে গেল। একটা
 নোংরা গর্তে তার পা পড়েছে। তাকে ঘিরে ধরে নোংরা ও অশ্লীল
 বিদ্বেষ বর্ষণ করে আমরা এক ধরনের বীভৎস উল্লাসে তাকে অভিশাপ দিতে
 লাগলাম।

যখন দেখলাম বাহ করে তার পক্ষে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব, আর মনের
 ইচ্ছায় বিদ্বেষ করা যাবে, তখন কোন তাড়াহুড়ো না করে, নীচু
 গলায় আমরা এসব করতে লাগলাম। খুবই আশ্চর্যের বিষয়, আমরা
 ওক আঘাত করলাম না। সে আমাদের মাঝখানে ধাঁড়িয়ে, এপাশ ওপাশ
 মাথা ঘুরিয়ে সমস্ত অপমান শুনছে, এবং আমরা আরও বেশী জোরে ও
 ক্রুদ্ধভাবে আমাদের ক্রোধের বিষ ও বিস্তা তার দিকে ছুঁড়ে দিতে লাগলাম।

তার মূখ প্রাণহীন, ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সেই নীল চোখজোড়া, একটু
 আগেও যা খুশীতে ভরপুর ছিল, ঘোলাটে হয়ে গেল। সে হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে
 নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগল, তার ঠোঁট কাপতে শুরু করল।

এবং আমরা তার চারিদিক থেকে বেষ্টন করে তার প্রতি আমাদের
 প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে লাগলাম—কারণ, সে কি আমাদের নিঃশ্ব করে
 ঘের নি? সে ছিল আমাদের। তার জন্যই স্বপ্নের স্রষ্টা অনুভূতিগুলো

হারিয়েছি, এবং যদিও সেইসব শ্রেষ্ঠ অনুভূতি নিতান্তই একটি ভিক্টুরের সম্পদ, কিন্তু আমরা হাশিষজ্ঞান আর সে একা এবং তার অপরাধের সমতুল্য কোন বেদনাই আমরা প্রকাশ করতে পারলাম না। আমরা কি ভাবেই না তাকে অপমান করলাম ! সে একটি কথাও বলল না, কিন্তু প্রচণ্ড ভয়ে তার সারা শরীর কাঁপতে লাগল এবং সে শুধু আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমরা হো হো করে হাসলাম, হৃৎকায় দিলাম, দাঁত মৃৎ খিঁচিয়ে উঠলাম। অন্যান্য লোকেরাও এসে পড়ল। আমাদের একজন তানিয়ার ব্রাউজের হাতা ধরে টানল।

হঠাৎ তার চোখ জ্বলে উঠল। সে ধীরে হাত তুলে চুল ঠিক করল এবং স্থির উচ্চস্বরে আমাদের মূখের উপর বলে উঠল :

‘ওঃ, যত সব জঘন্য জেলঘৃদ্ধ !’

যেন আমরা সেখানে নেই, তার পথে দাঁড়িয়ে নেই, ঠিক এইভাবে সে সোজা আমাদের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে গেল। বস্তৃত মনে হল, ঠিকই যেন আমাদের কেউই তার পথে দাঁড়িয়ে নেই। বেষ্টনীর থেকে যখন সে পূরাপূরি বেরিয়ে গেছে, আমাদের দিকে না তাকিয়ে ঘৃণা ও গর্ব মিশ্রিত স্বরে একই রকম চিৎকার করে সে বলে উঠল :

‘যত সব নোংরা, শূন্যোরের দল। জন্তুর দল।’ এবং সে চলে গেল—সোজা, স্তম্ভর ও গর্বিত।

উঠানে কাদার মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম, মাথার উপরে বৃষ্টি পড়ছে এবং ধূসর আকাশে সূর্যের দেখা নেই।

তারপর আমরাও আবার আমাদের সংগাতসেতে কুঠুরির কারাগারে ফিরে গেলাম। আগের মতোই, সূর্য কখনও আমাদের জানলা দিয়ে উঁকি মারে না। এবং তানিয়াও আর কখনো এখানে আসে না।

কোলুয়া

রোদবৃষ্টিতে জীর্ণ, আগাছার জঙ্গলে ঢাকা কবরখানার এই দুঃস্থের পদত্বার অংশে, বার্চগাছের চিকন ছায়ায় এক অর্ধ-বয়স্ক নারী নিঃসঙ্গ বসেছিল। পরনে তার ছাপ-ছোপ পোষাক এবং গা-মাথা ঢাকা একটি কালো ছেঁড়া শাল। অগোছালো কাঁচা-পাকা চুলের গোছা তোবড়ান গালের একপাশে ছাড়িয়ে পড়েছে; ঠেঁটজোড়া কাঁঠন এবং ঝিৎ ঝড়লে-পড়া। কি এক শোকজর্জর হাহাকারে মৌন। চোখের পাতা ফোলা এবং ভারী—গোপন অশ্রু এবং বিনম্র রজনী যাপনের চিহ্ন।

একটু দূরে আমার নিঃশব্দ ঘাঁড়িয়ে থাকার প্রতি তার কোনে झুঞ্চেপই ছিল না এমনকি আমি আরও কাছাকাছি এলে সে কেবল একবার অনদ্ভুল চোখজোড়া তুলে ঝিৎ দৃষ্টিপাত করেই আবার নত হয়ে রইল—আমার প্রতি কোন কোতূহল, অসন্তোষ বা এ জাতীয় কোন অনদ্ভূতি দেখা গেল না।

ভদ্রতার খাতিরে একটু অভ্যর্থনা জানিয়ে আমার প্রথম আলাপ শব্দ হল এবং জিজ্ঞেস করলাম, সামনের ছোট কবরটুকুতে কে শরে আছে।

‘আমার ছেলে’—সে উদাস গলায় উত্তর করল।

‘বয়স্ক?’

‘বার বছর বয়স’

‘কবে মারা গেছে?’

‘চার বছর আগে।’

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে তালিমারা শালের কিছুটা অংশ পিঠ থেকে সরিয়ে নিল। খুব গরম পড়েছে; জ্বলন্ত সূর্য নির্মমভাবে আগুন ছড়াচ্ছে নির্জন এই মৃত-ভূমিতে। কবরের ঘাস ধুলো ও তাপে বিবর্ণ হয়ে গেছে; উর্ধ্বমুখী ব্রহ্মশূলোর পাশে পাশে অবিন্যস্ত গাছগুলো যেন নিঃসঙ্গ প্রাণহীন। বালকটির কবরের দিকে ঝুঞ্চে আমি প্রশ্ন করলাম, ‘এইটুকু বয়সেই কি করে মরল?’

‘ঘোড়ার খুরে ধলে-পিষে গেছল’—সংক্ষিপ্ত উত্তরের পরই সে কাঁপা—

কাঁপা শব্দ হাতখানা বাড়িয়ে কবরের চাঁপটা স্পর্শ করল।

‘ঘোড়ার খুরে ?...কেমন করে হল ?’

বুলালাম কোতুহলে সৌজন্যবোধের সীমা ছাড়িয়ে বাঁছি কিন্তু মহিলার অশ্রুত নিষ্পৃহতার মরিয়া হয়েই কুটিল, অনির্বচনীয় মনের খেলালে আমি ওর অপ্রজ্ঞল দেখতে চাইলাম। তার এই নিষ্পৃহতার একটু বিশেষত্ব ছিল তাই আমার প্রশ্নে তার কোন পরিবর্তন ঘটল না। কেবল মৃদু ভুলে নিঃশব্দে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে, উদ্বাস গলার তার কাঁহিনী শব্দ করল। কাঁহিনী শব্দের আগে আমি আবার তার ভারী নিঃশ্বাস শুনতে পেলাম।

‘এভাবেই মরেছিল। অর্থ আত্মসাৎ-এর অপরাধে ওর বাবার যখন দেড় বছর জেল হল, আমরা আমাদের খর্ব-কুড়ো পর্জিটদুকে খেয়ে নিঃশেষ করে ফেললাম। অনন্যোপার হয়ে, অবশেষে, কাঠ, শিকড়-বাকল জ্বালানীর জন্য বিক্রী শব্দ হয়ে গেল। আমার এক পরিচিত মালী একগাড়ী পচা জ্বালানী বিক্রেতাইল, আমি তা গোবর মেখে শাকিয়ে বিক্রী করতাম কিন্তু সেগুলো থেকে প্রচুর ধোঁয়া বেরোত এবং রান্না থেকেও উঠত সে গন্ধ। কোলুবা বেত পাঠশালায়। খুব ছটফটে এবং হিসেবী। সে বুঝতে আমার দুঃখের কথা। বাড়ী ফেরার পথে সামান্য কাঠ-কুটোটি পেলেও সবসঙ্গে সে বাড়ী নিয়ে আসত।

তখন বসন্তকাল, বরফ গলতে শব্দ করছে। সামান্য একটা ফেব্রু-বুট ছাড়া ওর কিছু ছিল না। বাড়ী ফিরে যখন জুতো ছাড়ত, পাতাজোড়া ঠান্ডায় লাল হয়ে যেত।

সেই অবস্থায় একদিন গাড়ীতে করে ওর বাবাকে বাড়ী পেঁাছে বিয়ে গেল জেল কর্তৃপক্ষ। কারণ হৃদরোগে ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়েছে সে। ছেঁড়া বিছানায় শুয়ে সে আমার দিকে ত্বর, দুর্বোধ্য হাসিতে তাকিয়ে থাকল; আমিও ওর দিকে এমন একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করতাম ভাবখানা যেন, ‘তোরা জন্য আমাদের এই নিৰ্বাচন, কি করে এখন আমি সামান্য খর্ব-কুড়ো যোগাড় করি! কাবাজলে ভুবে মর, আমার হাড় জুরোর।’ কিন্তু কোলুবা ওর বাপকে কেখেই আঁতকে উঠল; ভয়ে তার মৃদুতা ফ্যাকাশে, চোখের জল ফেলে ফলল, ‘বাবার কি হয়েছে, মা?’ বললাম, ‘ওর দিন ফুরিয়ে গেছে।’ তারপর

থেকেই আমাদের অবস্থার আরও অবনতি ঘটতে লাগল।

খেটে খেটে আমার বেহ করে যেতে লাগল, ভবুও দৈনিক—বরাং ভাল থাকলেও—কুড়ি কোপেকের বেশী হাতে আসছিল না। এর চাইতে মরণ ভাল; আমি মাঝে মাঝে ভাবতাম বেহের জ্বালা-মশলা জুড়িয়ে দেই। কোলদুবা আমার মনের কথা বেন শুনতে পেত আর বিমর্ষ গোমড়ামুখে বেরিয়ে যেত বাড়ী থেকে। যখন ভাবতাম আর পারছি না সহ্য করতে, চোঁচিয়ে উঠতাম, ‘হায়! এই পশুর জীবন কি আমার ভাগেই লেখা ছিল। ভগবান, মরণ হয় না কেন আমার।...তোরা, তোদের একটা মরলেও আমার হাড় জুরোয়!’—ইঙ্গিতটা গুর বাপ এবং কোলদুবার প্রতি। রুম্ম বাপ কথাগুলো শুনে মৃদু মৃদু মাথা দোলাত, বেন বলতে চাইছে, ‘অভিশাপের দরকার নেই গো, বিন আমার এমনিতেই ঘনিয়ে এসেছে; একটু অপেক্ষা কর।’ কোলদুবা অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ী থেকে গেল বেরিয়ে। চলে যেতেই মন আমার ডেকে উঠল, ‘কি কথা মূখে আনলাম!’ কিন্তু তখন ঘেরী হয়ে গেছে, খুব ঘেরী। ঘন্টাখানেকও বোধহয় ধারনি, দরজার সামনে এসে পদলিগের ঘোড়ার গাড়ী থামল। ‘এটা কি শিশেনিনার ঘর?’ ভারী গলা শুনে ভেতরটা আমার ধক করে উঠল। মৃদু বাড়তেই হেঁকে উঠল, ‘একবার হাসপাতালে যেতে হবে।...তোর ছেলে ব্যবসায়ী এ্যানোখিনের ঘোড়ার গাড়ীতে চাপা পড়েছে।’ দ্রুত ছুটে গেলাম হাসপাতালে। যতক্ষণ গাড়ীর সিটে বসেছিলাম মনে হচ্ছিল শরীরে কে বেন রাশি রাশি জ্বলন্ত করলা ঢেলে দিচ্ছে। মনে মনে নিজেকে বলছি, ‘হতভাগী, এ কি করলি তুই!’

দুকেই দেখি, সমস্ত শরীর ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থার একটা জীর্ণ খাটে কোলদুবা পড়ে আছে। আমাকে দেখেই চোখ তুলে স্বান হাসল, গাল বেয়ে নামল অশ্রুজল। বিড়বিড় করে উঠল সে, ‘কমা কর আমাকে মা, কমা কর। পদলিশেরা আমার পরসাগগুলো কেড়ে নিয়েছে।’ ‘কোন পরসার কথা বলছিস, কোলদুবা?’

‘আমাকে, আমাকে পথের লোক আর এ্যানোখিন বা দিরোছিল।’ আমি ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কেন, কেন তারা দিরোছিল?’

‘আমি...আমি...’ শেষ করার আগেই সে বস্ত্রগার কান্ডরাতে লাগল।
চোখ বুটো তার বেরিয়ে আসতে চাইছে।

‘কোল্‌মো, বাছা আমার! ঘোড়াগুলোকে আগ থেকে দেখতে পারলি না?’ ধীরে ধীরে জবাব দিল, ‘দেখেছিলাম, মা। কিন্তু পথ ছেড়ে উঠতে চাইনি আমি। ভাবলাম, আমার শরীরের ধার দিয়ে গেলে, পথের মানদ্রু হরত সহানুভূতিতে ক’টি বেশী কোপেক দেবে।...’বিরেওঁছিল।’

ব্যাপারটা আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠতেই কেঁপে উঠলাম, ‘বাছা, এ তুই কি করতে গেলি!’ কিন্তু চোখের জল ফেলারও আর অবসর ছিল না।

পরদিন সকালে সে মারা গেল। মৃত্যুর আগের মৃদুহৃৎও তার জ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পারানি, অনর্গল বিড়বিড় করে গেছে, ‘বাবা, এটা-ওটা কিনো। ভোমার নিজের জন্য যা ভাল লাগে এ পরসায় কিনো!’ যেন সে প্রচুর অর্থ বাড়ীতে হাজির করেছে। আসলে ওর হাতের মৃদুঠোয় ছিল মাত্র সাতচল্লিশটি কোপেক।

আমি ব্যবসায়ী এ্যানোথিনের কাছে হাজির হতে, গজগজ করে পাঁচটা রুবল আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, ‘ছোঁড়া ইচ্ছে করেই’ত নিজেকে গাড়ীর তলায় গলিয়ে দিয়েছিল। রাস্তার সম্বাই দেখেছে। কিসের আশায় এসেছি তাহলে?’ আমি আর কোনদিন ও মৃদুখো হইনি। এই, এই হল আমার বাছার জীবনের পরিণতি, শুনলে ত এবার।”

সে চূপ করে গেল এবং আগের মতই নিরুদ্ভাপ, উদাসীন হয়ে উঠল।

কবরখানাটি মৃত্যুর মতই নীরব, নিঃসঙ্গ। ক্রুশ, প্রাচীন বৃক্ষ, মাটির টিপি এবং সম্মুখে বসা উদাসীন মহিলাটির বিষন্ন দীর্ঘশ্বাস,—মৃত্যু ও মানদ্রুের দৃশ্য-কষ্ট সম্বন্ধে আমাকে চিন্তিত করে তুলল। এদিকে মেঘশূন্য আকাশ থেকে আগুন স্রবছে মাটির বুকে।

পকেট থেকে কয়েকটি কোপেক তুলে, ভাগ্যের নির্মম হাতে নিগূহীত হয়েও পৃথিবীতে বেঁচে থাকা এই নারীর সামনে তুলে ধরলাম। সে মৃদু মাথা নাড়িয়ে, ফিসফিস করে জবাব দিল, ‘নিজের অভাবকে আর বাড়ান্ন কেন বাছা। আজকের জন্য ঘরে কিছ্ আছে আমার। বেশী’ত দরকার নেই আর।...আমি একা, পৃথিবীতে আমি এখন একা।’

গভীর নিঃশ্বাস ফেলে, শোকতপ্ত মৃদুখো ঠোঁটজোড়াকে আবার সে কঠিন করে তুলল।

পাঠক

তখন রাত হয়ে গেছে। আমি যে বাড়িতে কিছু ঘনিষ্ঠ লোকের কাছে আমার একটা সদ্য প্রকাশিত গল্প পড়ে শোনাজিলাম সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। তারা আমার উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেছেন। আমি নিজের রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছি—বেঁচে থাকার এ রকম আনন্দ আগে কখনও অনুভব করিনি।

ফেব্রুয়ারী মাসের পরিষ্কার রাত। আর মেঘমন্ড ভারকণ্ঠিত আকাশ পৃথিবীতে ঝরে-পড়া তুষারের মনোরম রাজমন্ডুকের উপরে প্রাণজন্ডানো শীতল নিঃস্বাস ফেলেছে। রাস্তার ধারে বেড়ার উপর ঝুঁকে থাকা গাছের ঝোপ-ঝাড়ে আমার পথের উপরে আপন খেলালে ছায়ার আলপনা আঁকু এবং চাঁদের কোমল নীল আলোর আভাস তুষার কণাগুলো আনন্দে ঝিকমিক করে উঠছে। কোথাও কোন প্রাণের আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। কেবল আমার পায়ের নীচে বরফ গর্দভা হওয়ার শব্দ। এই একমাত্র শব্দ বা ভাবগম্ভীর, স্মরণীয় এই রাত্রির নীরবতাকে ভেঙে খানখান করে দিচ্ছে।

আমার মনে হল, হ্যাঁ এই পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠা, নিজের লোকজনের মাঝে বিশিষ্ট হয়ে ওঠা খুবই সুখকর।

এবং আমার কল্পনায় আমার ভবিষ্যৎ...এর চিত্র আঁকতে গিয়ে কোন উজ্জ্বল রংয়ের পৌঁচই বাকি রইল না।

‘সত্যি, আপনার ছোট্ট গল্পটা খুবই আনন্দদায়ক। আপনাকে স্বাগত জানাই’, পেছন থেকে একটি ভাবগম্ভীর কন্ঠস্বর ভেসে এল।

চমকে ঘুরে তাকালাম।

পেছন থেকে, কালো পোষাকে ঢাকা একটা খুদে লোক কিছুটা এগিয়ে আমার পায়ে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে বৃষ্টিদীপ্ত হাসির অভ্যর্থনায় আমার মুখের দিকে তাকাল। লোকটার সবকিছুই ধারালো : চোখের ঘৃষ্টি, গালের হাড়, সামান্য ঝলে থাকা ধাড়ি সম্বলিত পুতনি ; তার ফিট্‌কাট চেহারার মধ্যে চোষণীয়ানো চমক রয়েছে। লোকটা এমন নিঃশব্দে চলেছে, যেন

বরফের উপর দিগে ভেসে যাচ্ছে। ধরে প্রোত্যাহনের মধ্যে লোকটাকে দেখিনি, তাই এ গম্পের মস্তব্যে খুবই বিস্মিত হলাম। ও কে? কোথেকেই বা উন্নত হল?

‘আপনি কি...আপনিও কি ওখানে ছিলেন?’ আমি জিজ্ঞেস করলাম।

‘হ্যাঁ, আমিও সেই আনন্দেই অংশীদার।’

গায়কী ও সে কথাটা বলল। লোকটার ঠোঁটজোড়া পাতলা এবং ছোট কালো গোকজোড়া ঠোঁটের হাসিকে আড়াল করে না। তাই নিরবিচ্ছিন্ন হাসি অস্বাভাবিক সৃষ্টি করে। মনে হল এর মধ্যে এমন একটা ব্যঙ্গ লুকিয়ে আছে বা আমার কাছে আদৌ সুখের হয়ে উঠবে না। কিন্তু মেজাজটা আমার এতই ভাল আছে যে এই নতুন সঙ্গীটির এ বিষয়টার বেশী সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে করছে না। আর নিজের আত্মতৃপ্তির উজ্জ্বল আলোর এইসব ভাবনা দ্বারার মতো মূছে গেল। পাশে পাশে চলাছি আর ভাবছি সে কি বলবে এবং মনে মনে আশা করছি ওর বলার মধ্যে সন্ধ্যার অনুভূত সুখবায়ক মৃদুত্বগুলো আরও ঘন হয়ে উঠবে। স্বভাবতই মানুষ লোভী, কারণ ভাগ্যবশী সচরাচর তার উপর সদয় হাসি বর্ষণ করেন না।

‘প্রত্যেকেই নিজেকে অন্যের চেয়ে বিশিষ্ট ভাবতে ভালবাসে, তাই না?’ সঙ্গীটি প্রশ্ন করল।

এ মস্তব্যে আপত্তিকর কিছুই পেলাম না, তাড়াতাড়ি সারি দিলাম।

‘টি—হি—হি!’ ঝিক্‌ঝিক্‌ করে হেসে টানটান আঙ্গুলগুলো নিয়ে সে তার ছোট হাত দুটো এলোমেলো ঘসতে লাগল।

তার হাসির খোঁচা খেয়ে নীরস মস্তব্য করলাম, ‘আপনি দেখছি খুব আমদুখে লোক।’

মাথাটা হেলিয়ে, হেসে সে আমাকে সমর্থন করে বলল, ‘হ্যাঁ, আমি আমদুখে লোক। আবার আমার জানবার ইচ্ছাও খুব বেশী...। সব সময়ই—জানতে চাই—সব কিছুই জানতে চাই। আমার এই জানার ইচ্ছাটা চিরকালের। এই ইচ্ছার তাড়নার সর্বদা চালিত হয়ে আসছি। এখন বা জানতে চাই সেটা হল—এই সাক্ষ্যের জন্য আপনাকে জীবনে কি মূল্য দিতে হয়েছে?’

আমি ডাকিলে নিম্প্রভাবে উত্তর দিলাম :

‘প্রায় এক মাস...বা একটু বেশীই হরত লেগেছে।’

সে চটপট উত্তর দিল, ‘আঃ ! অস্পন্দ্য পরিভ্রম, বৈদেশিক জীবনের ছোট ছোট অভিজ্ঞতার সব সময়ই কিছ্ মূল্য আছে... । তবুও আমি বলব, এই যে আপনি ভাবছেন যে এই মূহুর্তে’ করেক হাজার লোক আপনার চিন্তার অংশীদার হচ্ছে, লেখা পড়ছে,—তার তুলনার এই মূল্য খুব একটা বেশী কিছ্ নয় । এবং এর পরেই আসে এই আকাঙ্ক্ষা যে সম্ভবতঃ, কালক্রমে... হাঃ—হাঃ ! আর যখন আপনি মরে যাবেন...হাঃ—হাঃ—হাঃ !...কারণ আপনার আরও বেশী কিছ্ দেবার ইচ্ছা জাগবে, আপনি আমাদের ইতিমধ্যে যা দিয়েছেন তার চেয়ে সামান্য কিছ্ বেশী । তাই নয় কি ?’

সে তীক্ষ্ণ কালো খুঁত চোখে আমাকে নিরীক্ষণ করে ঐক্ধিক্ বিদ্রুপের হাসিতে ফেটে পড়ল । আমিও তাকে নিরীক্ষণ করলাম এবং তারপর গম্ভীর, আহতস্বরে জিজ্ঞেস করলাম,

‘মাফ করবেন ... । আমি কার সাথে কথা বলছি জানতে পারি কি ?’

‘আমি কে জানতে চাইছেন ? বদ্বশতে পারছেন না ? বেশ, তাহলে আপাততঃ বলছিলাম আমি কে । কোন ব্যক্তির বক্তব্যের চেয়ে তার নাম জানাটাকে নিশ্চয়ই বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন না ?’

‘না, তা অবশ্য নয়... । তবুও ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত লাগছে,’ আমি উত্তর দিলাম ।

কেন জানি না সে আমার কোটের হাতাটা ধরে নীরবে মূচকী মূচকী হেসে বলল, ‘বেশ তো, অদ্ভুত লাগুক না । বৈদেশিক অভিজ্ঞতার বাইরে, মাঝে-মাঝে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে বেকোন লোকের রাজী হওয়া উচিত । ...আর আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে আসুন আমরা মন খুলে কথা বলি । ধরুন, আমি একজন পাঠক—একজন অচেনা পাঠক । ধরুন, এমন একজন পাঠক যে খুব উৎসুক হয়ে জানতে চায় যে ঠিক কেন ও কভাবে বই লেখা হয়—এই ধরুন, আপনার যে বইটা লেখা হল তার বিষয়ে আমরা কিছ্ আলোচনা করি ।’

আমি বললাম, ‘আরে, এতো খুবই আনন্দের কথা...রোজ তো আর

একম লোকের সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা বলার সুযোগ পার না……’ কিন্তু মিথ্যা বললাম। আসলে পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে খুব খারাপ লাগছে। লোকটা চায় কি? একটা সম্পূর্ণ অজানা অচেনা লোকের সাথে এই হামলায় কথাবার্তাকে বিতর্কের মধ্যে দিয়ে যেতে দেব কেন?

একইভাবে আমি তার পাশাপাশি ধীর পদক্ষেপে হেঁটে চলছি আর কিন্নর মনোযোগের ভাব আনবার চেষ্টা করছি। এ ভাব আনতে খুব কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু যেহেতু আমার মেজাজ এখনও বেশ ভাল আছে, এবং যেহেতু তার সাথে কথা না বলে তাকে অপমানিত করতে চাই না, আমি নিজেকে সংবত রাখবারই মনস্থির করলাম।

চাঁদটা আমাদের পেছনে চলে গেছে। ফলে পথে পড়েছে আমাদের ছায়া, ছায়াবৃন্দগুলি মিলেমিশে কালো অধারের টুকরো হয়ে আগে আগে বরফের উপর দিয়ে হামাগুর্দা দিয়ে চলছে এবং সৌরিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, আমার ভেতরেও এমন একটা কিছ্ জন্মাতে শুরুর করেছে যা এই ছায়ার মতোই অশুভকারাচ্ছন্ন, মোহ সৃষ্টিকারী এবং আমার সামনে সামনে চলছে।

মিনিট খানেক আমার সঙ্গীট চুপ থেকে এমন একজন আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন লোকের স্বরে কথা বলে উঠল যে আপন চিন্তাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

‘মানব-প্রকৃতির গতিবিধির চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও চিন্তাকর্ষক জিনিস পৃথিবীতে আর কিছ্ নেই……তাই নয় কি?’

আমি মাথা নাড়লাম।

‘আপনি মানছেন!……তবে আসুন আমরা মন খুলে আলোচনা করি— এই বৃদ্ধক বয়সে কখনও মন খুলে আলোচনা করার সুযোগ নষ্ট করবেন না!’

কি অদ্ভুত লোকের বাবা, আমি ভাবি; হঠাৎ উৎসাহভরে বকু হেসে প্রশ্ন করলাম, ‘কিন্তু কি নিয়ে আলোচনা করব?’

লোকটা মৃদুহৃৎের জন্য আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল, তারপর আঁত পুরিচিত পুরোনো বন্ধুর মতো চেনাশুরে বিষয় প্রকাশ করে বলে উঠল, ‘আমরা সাহিত্যের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করব!’

‘ঠিক আছে, কিন্তু—বেশ রাত হয়ে গেছে না কি?’

বুঝে নেই ! না—আপনার কাছে এটা বুঝে নেই রাত নয় !

কথাকটা আমাকে খামিয়ে দিল। সে এমন আন্তরিক আশ্বাসের সুরে কথা-
কটা বলল, যা এমন রূপকথার মতো যে আমি তাকে কিছ্ একটা জিজ্ঞেস করার
জন্য থেমে গেলাম। কিন্তু সে আমার হাত মৃদু আকর্ষণ করে আমাকে এগিয়ে
নিতে লাগল।

‘বুঝবেন না। বেশ ভাল রাত্তা দিয়েই যাচ্ছি...। বাহোক, অনেক
আলাপ পরিচয় হল। এখন বলুন, সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি?...আপনি
সাহিত্য চর্চা করেন, সুতরাং আপনার এটা জানা উচিত।’

আমি ক্রমশঃ এত বিস্মিত হয়ে পড়ছি যে নিজেকে স্থির রাখতে পারছি
না। কি চান লোকটা আমার কাছে ? কে ও ?

আমি বললাম, ‘হ্যাঁ মন্দন, আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে এই
সমস্যা...।’

‘একটা সত্যিকারের ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে করা হচ্ছে, বিশ্বাস করুন। ভাল
উদ্দেশ্য ছাড়া এ পৃথিবীতে কোন কিছ্ই ঘটে না...। সুতরাং চলুন একটু
জোরে পা চালাই, না না সামনে নয়, ভেতরের দিকে।’

এভাবে কথার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়াটা নিশ্চয়ই বুঝে মজার ব্যাপার, কিন্তু
লোকটার কথায় আমি বিরত হলাম। এগিয়ে যাবার জন্য পুনরায় অধৈর্য
হয়ে উঠলাম। কিন্তু সে শান্তভাবে কথা বলতে বলতে আমার পিছদ নিল।

‘আমি বেশ বুঝতে পারছি। এই মৃদুতে আপনার পক্ষে সাহিত্যের
উদ্দেশ্যের কোন সংগা দেওয়া কঠিন। আমি নিজেই একটা সংগা দেওয়ার
চেষ্টা করছি।’

সে একটা স্বীকৃতি টেনে, হেসে আমার মৃদুতর দিকে তাকাল।

‘আপনি নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবেন যদি আমি বলি, মানদ্ব্য বাতে
নিজেকে বুঝতে পারে, বাতে তার নিজের উপর বিশ্বাস বাড়বে এবং বাতে তার
সত্য সত্যের ইচ্ছা জাগ্রত হয় ; বাতে তার নীচতা ও ক্ষুদ্রতা ধরে ধরে,
শুদ্ধবুদ্ধির উন্মেষ হয়, তার মনে লজ্জা, ক্রোধ ও সাহসের অনুভূতি জাগ্রত
হয়, সাহিত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে সে বিষয়ে মানদ্ব্যকে সাহায্য করা। এমন কিছ্
করা বাতে সে মহানরূপে শব্দ ও সমর্থ হয়ে উঠে নিজের জীবনকে সম্পূর্ণ

স্বাক্ষর উপস্থাপনার ভরপূর করে তুলতে পারে। এ হ'ল আমার সংগী ; অবশ্য
এটা একটা মোটামুটি সংগী হ'ল...। জীবনকে অনুপ্রাণিত করার মতো যা
কিন্তু আছে এর সাথে যোগ করে নেবেন। এখন বলুন—আপনি কি এই
সংগীতের সাথে একমত ?

আমি বললাম, 'ঠিকই বলেছেন। প্রায় বর্ষাধিই হয়েছে। সাধারণভাবে
এটাই ধরে নেওয়া হয় যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব জাতিকে মহৎ করে
তোলা।'

'তা হলে কি মহান কত'বাই না আপনি পালন করছেন।' লোকটা বেশ
মিষ্টি করে কথাটা বলল—এ২৭ আবার পরিচিত ব্যক্তির হাসি হাসল।

'কিন্তু এসব কথা বলেছেন কেন ?' প্রশ্ন করলাম—ভাবখানা এমন যে
তার হাসি যেন আমি গায়েই মাখিনি।

'ভাবছেন কেন ?'

কয়েকটি কড়া মন্তব্য মনে করার ব্যর্থ চেষ্টার পর বললাম, 'সত্যি কথা
বলতে কি...।' সত্যি কথা বলা বলতে কি বোঝার ? লোকটি বোকা নয়, সে
নিশ্চয়ই জানে মানুষের এই সত্যি কথা বলার সীমানা কত ক্ষুদ্র এবং আত্ম-
সম্মানের ঘেরাটোপে কি কঠিন গন্ডীতে বাঁধা। সঙ্গীটির দিকে তাকাতেই
মোঁখ সে হাসছে ; আমি ভীষণ মমাহিত হলাম —এই হাসিতে রয়েছে প্রচন্ড
বিদ্বেষ ও ঘৃণা। আমার ভয় করতে শুরু করল ; এমন ভয় যে এখনি
পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।

'শুভস্বাস্থি', টুপিটা তুলে ধরে হঠাৎ বলে ফেললাম।

'কেন ?' লোকটা নম্রভাবে বিস্ময় প্রকাশ করল।

'এমন ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না যা শেষ পর্যন্ত মাথা ছাড়িয়ে যায়।'।

'ও, তাই আপনি চলে যাচ্ছেন ?...ভাল কথা, যা ইচ্ছা করুন। কিন্তু
মনে রাখবেন যদি এখন চলে যান তবে আমাদের আর কখনই সাক্ষাৎ
হবে না।'

লোকটি 'কখনই' শব্দটার উপর জোর দিল এবং কবরখানার বস্তুর মতো
তা আমার কানে কেঁজে উঠল। আমি এই শব্দটাকেই সর্বদা ভয় ও ঘৃণা
করে এলোঁক। এটা যেন মানুষের আশাকে নষ্ট করার জন্য বিদ্রোহের

বিশিষ্ট, বিশাল হাতীকর মতো ভারী, শীতল একটি কিছ। এই শব্দটাই আমাকে ধাক্কা দিল।

‘আপনি কি জান বলুন ভো?’ করুণ ও হৃদয় সুরে আমি কথাটা জিজ্ঞেস করলাম।

সে ফের হেসে বলল, ‘আলদুন, বারি’ এবং শব্দ ধাবার হাতটা ধরে আমাকে টেনে বসাল।

এখন আমরা মিউনিখপ্যালিটির বাগানে একটা রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছি—রাস্তার উপরে লোকাস্ট ও লিলাক গাছের বরফ-ঢাকা নিচল ডাল-পালা ঝুলে রয়েছে। চাঁদের আলোর ঐকমিকরে ডালপালাগুলো আমার মাথার উপরে ঝুলছে এবং মনে হচ্ছে বরফ ও কুরাশার ঢাকা এই শব্দ ডালগুলো আমার বুক ভেদ করে স্তব্ধপন্ডের গভীরে আঘাত করছে।

সঙ্গীটির ব্যবহারে বিস্মিত ও হতবিস্মল হয়ে নীরবে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ভাবলাম, লোকটার নিশ্চয়ই একটা কিছ গন্ডগোল আছে—মানে লোকটার এই ব্যবহারের একটি অবিধাজনক ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করলাম আর কি। কিন্তু সে যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারল।

‘আপনি ভাবছেন আমি অপ্রকৃতিছ? ওসব কথা বাতিল। এটা খুবই সস্তা ও বাজে ধারণা! প্রায়ই আমরা এইসব কথা বলে কি ভাবেই না একজন মানুষকে বুঝতে অস্বীকার করি, অথচ সে হয়ত আমাদের চেত্রেণ বোঝার মৌলিক চিন্তা করে। আর কি ভীষণভাবেই না এই ধারণা আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে এক দুঃখজনক কৃত্রিমতা চিরস্থায়ী করে ও বাড়িয়া তোলে!’

‘হ্যাঁ, সত্যিই...’, লোকটির উপস্থিতিতে আরও বেশী বেশী করে বিরক্ত বোধ করে আমি বলি। ‘কিন্তু যদি অনুমতি দেন, মানে আমাকে ছেড়েই হবে...। আমার বাবার সময় হয়ে গেছে।’

সে কথি ঝাঁকিয়ে বলে ওঠে, ‘ঠিক আছে, বান। বান...জবে মনে রাখবেন এই তাকানো করে আপনি নিজের প্রকৃত স্বরূপটিই কল্প করছেন।’ সে আমার হাতটা ছেড়ে দিল, আমি হটা লাগলাম।

ভালগার তাঁরে কোন একটি পাহাড়ের উপরে পার্কের ভেতর ভাকে কেন্দ্রে রেখে চলে এলাম—তুমারে ঢাকা পাহাড়টার পারে-ঢাকা-পথের কালো কিতোর আঁকবুঁকি অঁকা। তার সামনে, নদীর ওপারে রয়েছে নিঃশব্দ বিস্তৃত সমতলভূমির একটি বিস্তীর্ণ হৃদ্যপট। একটি খেঁচে বসে ধরে বিগলিতর দিকে সে তাকিয়ে রইল, আর আমি পথ ধরে নীচের দিকে হট্টতে লাগলাম। বেশ বৃষ্টিতে পারাছি তার কাছ থেকে পালাতে পারব না, ভবৎ আমি হট্টতে লাগলাম। লোকটা যে আমার মনে কোন রেখাপাতই করেনি এটা দেখানোর জন্য আমি কি জোরে হট্টব, না আস্তে ?

শুনতে পেলাম লোকটা শিব দিগে একটা চেনা সুর ভাঁজিতে শব্দ করছে...। গানটা সেই অস্থ মান্দবকে নিয়ে একটা ছোট করুণ ও কোঁতুক গান যে আর একটা অস্থ মান্দবকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কেন সে এই বিশেষ গানটা বেছে নিল ভাবছি।

আর তখনই অনুভব করলাম যে এই লোকটার সাথে সাক্ষাতের সমর থেকেই আমি একটা অশুভ ও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত অনুভূতির অস্থকার চক্রের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। আমার সাম্প্রতিক ভাবগভীর, আত্মহুঁশী মানসিকতা এক ধরনের অশুভ অনুভূতির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে।

কি করে সে-পথ দেখাবে গো নেতা,

যে-পথের তুমি জাননা বারতা ?

লোকটা শিব দিগে যে গানটা ভাঁজছিল তার কথাগুলো আমার মনে পড়ে গেল।

আমি ধরে পেছনের দিকে তাকালাম। সে তার হট্টর উপরে কনুই ঠেকিয়ে ভালদেতে চিবুক রেখে আমাকে দেখছে আর শিব দিচ্ছে। তার মূখের উপরে চাঁদের আলো পড়ার চক্চক্ করছে, আর নাচছে তার কালো গেমিজোড়া। ভয়ঙ্কর কোন এক অশুভ পরিণতির আশঙ্কার আমি কিলে দাবার জন্য মনোহর করলাম। কিলে গিয়ে তার পাশে বসে শান্ত, আত্মহুঁশী বসলাম, 'ঠিক আছে, আশুন আমরা সরল মনেই কথা বলি...'।

সে মাথা নেড়ে বলল, 'আমাদের সকলেরই সরল হওয়া দরকার।'

'আমার ধারণা, আমাকে প্রভাবিত করার মতো ক্ষমতা আপনার আছে

এক আমরকে করার মতো আপনার নিশ্চয়ই কিছু কথাও আছে...। তাই
নয় কি ?

‘হাক, শেষ পর্বত শোনবার মতো সাহসটুকু অর্জন করলেন।’ সে সহাসে
বিশ্বের প্রকাশ করল ; কিন্তু এখন তার হাসিটা আগের চেয়ে ভিন্ন এবং এই
হাসির মধ্যে আনন্দের ছোট ছোট চেউ-এর মতো কিছু একটা আছে বলে মনে
হল।

আমি বললাম, ‘বেশ ভাল কথা, এবার বলুন। আর আপনার ঐ অশ্রুত
‘ভাবভঙ্গীগুলো বাহা দিয়ে যদি আপনি...।’

‘দেব ভাল কথা ! কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই মানবেন, ঐ অশ্রুত ভাব-
ভঙ্গীগুলো আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যই প্রয়োজন ছিল। বা
কিছু স্পষ্ট ও সাধারণ, সেগুলোর প্রতি আমাদের আগ্রহকে ভোঁতা করে দিয়েছে
এই আধুনিক জীবন ; এ জীবন আমাদের কাছে খুবই কঠিন ও শীতল।
আর কোন কিছু উষ্ণ ও নরম করার ক্ষমতাই আমরা হারিয়ে ফেলেছি,
কারণ আমরা নিজেরাই যে শীতল ও শক্ত হয়ে পড়েছি। মনে হয়, আমাদের
আবার ভৌতিক মায়াকম্প, উদ্ভট কম্পনা, স্বপ্ন ও অশ্রুত সব জিনিসের
প্রয়োজন। আমরা যে-জীবন গড়ে তুলেছি তার কোন রঙ নেই—একধেঁরে
ও নীরস। আমরা যে এক সময় নতুন কিছু করার জন্য এত ব্যগ্র ছিলাম
এই সত্যই আমাদের ধ্বংস ও হত্যা করেছে...। আমাদের কি করার আছে ?
বাহোক, আমরা চেষ্টা করে দেখি। সম্ভবতঃ আবিষ্কার ও কম্পনার ক্ষমতা
মানুষকে ক্ষণিকের জন্য এই পৃথিবী থেকে উর্বে তুলে ধরতে এবং পুনরায়
তার স্তম্ভস্থান চিনে নিতে সাহায্য করবে। কারণ তা হারিয়ে গেছে, তাই
নয় কি ? মানুষ আর এই পৃথিবীর প্রভু নয়। সে জীবনের জীতিবাসে
পরিণত হয়ে গেছে ; সত্য ঘটনার কাছে রাখা নত করার তার প্রধান অঙ্গবন্ধ
সেই পর্বকেই হারিয়ে ফেলেছে। তাই নয় কি ? তার নিজেরই স্মৃতি ঘটনা
থেকে সিস্থান্ত নিয়ে সে বলে যে এটা একটা স্বপ্ন নিয়ম ! এবং নিয়মের
প্রতি আনুগত্যের কলেই যে সে স্বাধীন সৃজনশীলতার পথে বাঁধা সৃষ্টি
করেছে, এ কথা সে খুব ভুল অক্ষম। সে দেখেনা যে সৃষ্টির জন্য ধ্বংস করার
আধিকারের সংগ্রামের ক্ষেত্রেও সে নিজেকে সংকুচিত করে ফেলেছে। এমন কি

সে এখন কোন সংগ্রামই করছে না, কেবল মানিয়ে চলছে... । সংগ্রাম করার বিষয় তার আর কি আছে ? কোথায় সেই আদর্শ বায় জন্য সে পৌর-বীরের প্রকাশ ঘটাবে ? সেই কারণেই জীবন এত ক্ষুদ্র ও ভোঁতা, সেই কারণেই মানুষের সৃজনশীল কল্পতা বাঁধা পড়ে গেছে... । কেউ কেউ অশ্রদ্ধা করে সেই জিনিস পেতে চায় বা তার মনে ডানা লাগিয়ে দেবে এবং তার নিজের মধ্যে মানুষের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনবে । বেশীরভাগ সময়েই তারা সেখানে ধারণা যেখানে রয়েছে শাস্ত্রত বিষয়সমূহ, বা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে, যেখানে ঈশ্বরের বাস... । সত্যের সম্মুখীন যারা পথ হারিয়ে ফেলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় । ধ্বংস হোক তারা, আমরা তাদের বাঁধা দেব না, বা তাদের প্রতি করুণাও প্রকাশ করব না—পৃথিবীতে আরও অনেক অনেক মানুষ আছে ! এখন প্রয়োজন উদ্বেগজনক, ঈশ্বরকে পাবার কামনা, এবং ঈশ্বরকে পাবার কামনার ভরপুর মানুষের সাথেই তিনি থাকেন ও তাদের জীবনে পূর্ণতা এনে দেন । কারণ তিনিই হলেন পূর্ণতার জন্য শাস্ত্রত প্রচেষ্টার স্বরূপ... । তাই নয় কি ?

‘হ্যাঁ, তাই,’ আমি বললাম ।

‘আপনি দেখছি খুব সহজেই একমত হয়ে যান ।’

সঙ্গীটি পুনরায় বিদ্রুপের হাসি হেসে কথাটা বলল, এবং তারপরই ধীরে ধীরে মেলে চুপ করে গেল । সে অনেকক্ষণ চুপ করে রয়েছে, এবং আমি আশ্চর্যে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম । সুদূরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, আমার দিকে না তাকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনার ঈশ্বর কে ?’

এই প্রশ্নটার পূর্বমুহূর্তেও সে শান্ত ও নম্র স্বরে কথা বলছিল এবং তার কথা শ্রুতেও বেশ ভাল লাগছিল ; সমস্ত চিত্তাশীল মনীষীর মতো এই লোকটিও কিংবা বিষয় এং এটাই তাকে আমার আরও কাছে টেনে এনেছে । মনে করছিলাম তাকে আমি বক্তৃতা পারছি এবং আমার বিরত ভাষণও ধীরে ধীরে শ্রবণ করছিলাম । হঠাৎ এই লোকটা এমন একটা কঠিন প্রশ্ন হঠাৎ দিল যে আমার মস্তিষ্কার যে কোন মানুষের পক্ষে এর উত্তর দেওয়া খুব কঠিন—অসম্ভব দাঁড়িয়ে সে নিজের কাছে সং হয় । আমার ঈশ্বর কে ? বাই আমি তাই জানতাম ।

এই প্রসঙ্গের কাছে আমি পরাজিত হয়ে গেলাম। কে-ই বা হবে না? আমার মতো অবস্থার পড়লে কার বৃষ্টি ঠিক থাকত? সে তীক্ষ্ণ বৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল, হাসল এবং আমার উত্তরের অপেক্ষায় রইল।

উত্তর দিতে সক্ষম ও আগ্রহী লোকের তুলনার আপনি অনেক বেশী সময় চুপ করে আছেন। মনে হচ্ছে, বর্ষা প্রসঙ্গটাকে এইভাবে রাখি তবে হয়ত আপনি আমাকে কিছু উত্তর দিতে পারেন; আপনি একজন লেখক, হাজার হাজার লোক আপনার লেখা পড়ে; তাহলে কি বানী যেন আপনি? আর কখনও কি ভেবে দেখেছেন আপনার শিক্ষা দেবার কোন অধিকার আছে কি না?’

এর আগে কখনও আমি মনের গভীরে চিন্তারাগিরি দিকে এত ঘনিষ্ঠভাবে তাকানোর জন্য পীড়িত হই নি। কেউ যেন মনে না করেন, মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যই আমি বিনয় প্রকাশ করছি বা নিজেকে অপমান করছি—ভিক্ষকের কাছে ভিক্ষা চাইবার কোন অর্থ হয় না। আমি নিজের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ সময় অনুভূতি ও কামনা, যথেষ্ট পরিমাণে, যাকে চলাতি কথার বলে, মজল-এর সম্ভান পেরেছি, কিন্তু আমার মধ্যে সে অনুভূতি খুঁজে পাইনি বা এই সব কিছুকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে, আর পাইনি এমন কোন স্বচ্ছ ও সুসংবদ্ধ চিন্তা বা জীবনের সমস্ত কার্যকারণকে বিজড়িত করতে পারে। আমার অন্তরে প্রভূত ঘৃণা রয়েছে, সেই ঘৃণা সর্বদা জমাট বাঁধছে এবং কখনও সখনও ক্রোধের সুস্পষ্ট অগ্নিশিখার ফেটে বেরচ্ছে; কিন্তু অন্তরে সশেষ হয়ে রয়েছে আরও অনেক বেশী। মাকে মাকে তা মন ও প্রাণের কাছে এমন বোঝা হয়ে দাঁড়ায় যে ভেতরে ভেতরে আমি জ্বালিতে একেবারে শেষ হয়ে যাই...। কোন কিছুই আমাকে আর স্বাভাবিক করে তুলতে পারে না, হৃদপিণ্ড মৃত ব্যক্তির মতো শীতল হয়ে যায়, মন ঘুমিয়ে পড়ে, কল্পনাগুলো হৃদযন্ত্রের দ্বারা তাড়িত হতে থাকে। এই অবস্থা, এই অন্ধ বর্ষার এবং মৃত পারিবারিক বেশ কয়েক দিন ও রাত ধরে চলে—তখন আমার কোন কামনা, কোন বোধশক্তি থাকে না; এ পর্বারে মনে হয় আমি যেন একটা মৃতদেহ, কোন অজ্ঞাত কারণে আমাকে কবর খোঁদা হচ্ছে না। বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতার কালে এই মরনের একটি অস্তিত্বের ভয়ংকরতা আরও বৃষ্টি পায়, কারণ মৃত্যুর মধ্যে অর্ধবহতা রয়েছে অনেক কম আর

অধিকার অনেক বেশী...সন্তোষ, হৃদয় করার বিলাসিতাকেও তা বেড়ে নিয়ে গেছে।

তাহলে, প্রকৃত অর্থে কি আমার বানী? কি শিক্ষা বিই হল হাবি করি? যে আমি প্রকৃত আমি? এবং জনগণকে বলবার আমার কিই বা আছে? বহু আগেই মানুষকে বা বলা হয়ে গেছে, সর্বদা তাবের বা বলা হয়, তাই? বা মানুষকে শোনানো হয়, অথচ যাতে তাবের কোন উন্নতি হয় না, তাই? কিন্তু যে আমি তাবের অবলম্বন করে গড়ে উঠে তাবেরই নিষেধের বিপরীত কর্ম করি, সেই আমার কি অধিকার আছে তাবের এইসব ধ্যান-ধারণার শিক্ষা দেবার? আর সে কাজ করলেও কি তাবের উপর আমার বিশ্বাস আমার প্রকৃত 'আমির' ভিত্তিমির উপর হৃদভাবে প্রোথিত একটি আন্তরিক বিশ্বাস হয়ে উঠত? পাশে বসে থাকা এই লোকটিকে আমি কি বলব? কিন্তু সে আমার উত্তরের অপেক্ষার থেকে ক্লান্ত হয়ে আবার কথা বলে উঠল।

'যদি আমি না দেখতাম যে উচ্চাশা এখনও আপনার সম্মানকে ধ্বংস করে নি তবে আপনাকে এই প্রশ্নও করতাম না। আমার কথা শোনবার মত সাহস আপনার আছে...। এ থেকেই আমি ধরে নিয়েছি, আপনার নিজের প্রতি সত্যিকারের ভালবাসা রয়েছে, কারণ তা জোরদার করার জন্য নিষাতিনের মধ্যেও আপনি নিজেকে গুটিয়ে নেন নি। সেই কারণেই আমার সাথে এই সংঘর্ষের যন্ত্রণা থেকে আমি আপনাকে মুক্তি দেব। আপনি ভুল করেছেন কিন্তু হাগী আসামী নন ধরে নিয়ে, আপনার সাথে কথা বলব।'

'কোন একসময়ে মহান পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব, জীবন ও মানবাত্মার নিগূঢ় পর্যবেক্ষকরা, জীবনকে নির্মল করে তোলার অদম্য উদ্দীপনার উদ্দেশ্যে মানুষের উপর গভীর বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত ব্যক্তিত্ব আমাদের মধ্যে বাস করতেন। তারা যেসব বই লিখেছেন তা কখনও বিশ্বাসিত অজলে হারিয়ে যাবে না কারণ তাতে রয়েছে শাস্ত্রের সত্যসমূহ, সেসব বইয়ের পাতা চিরস্থায়ী সৌন্দর্য বিকিরণ করছে। তাঁদের ভাবমূর্তি জীবন্ত, প্রেরণার শক্তিতে প্রাণবন্ত। এসব বইতে সাহস আছে, জলন্ত ক্রোধও আছে; সেগুলো আন্তরিক ও স্বেচ্ছা-প্রেমের সূত্রে বাঁধা, তার মধ্যে একটি অবাস্তব

সম্বন্ধ নেই। আমি জানি এই সমস্ত বই-ই আপনার আত্মকে প্ৰদীপ্ত
 করাইছিল...। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি বলব, আপনার আত্মার অশুদ্ধিট রূপে
 গেছে, কেন না সত্য ও প্রেম সম্পর্কে আপনি যা লেখেন তা মিথ্যা শোনায়,
 মনে হয় আরোপিত, বেন জোর করে এ সব বলছেন। আপনি চাইলেই মতো,
 প্রতিফলিত আলোর উজ্জ্বল; আর আপনার আলো ভীষণ ম্যাটমেটে, কেবল
 ছায়াই বাড়িয়ে চলে, সে মূর্খ আলোর উজ্জ্বলতা লাভ করে না কেউ। আপনি
 এতই সারস্বত্যা যে মানুষকে সত্য মূল্যের কোন কিছু দেওয়া আপনার পক্ষে
 সম্ভব নয়। আর আপনি যা দেন তা মনন ও শব্দের সৌন্দর্য দিয়ে জীবনকে
 সমৃদ্ধ করে তোলার চরম আনন্দদানের জন্য দেন না, বরং তা দেন নিজের
 পেশাগত অভিস্রবের এই আকস্মিক ঘটনাটিকে মানুষের প্রয়োজনীয় একটি
 বিশেষ ঘটনা হিসাবে তুলে ধরার জন্য। জীবন ও মানুষের কাছ থেকে
 আরও বেশী করে নেবার জন্যই আপনি দেন। উপহার দেবার ক্ষমতা
 আপনার নেই, আপনি নিছকই একজন তেজস্বীর কারবারী; সুখে
 নিজ অভিভূততার অংশমাত্র দেন, আর সেই সুখ মেটাতে হয় আপনার
 প্রতি মনোযোগ নিবেশ করে। আপনার কলম কদাচিৎ বাস্তবতার
 দাগ কাটে, সুকৌশলে জীবনের অতি মামূলি জিনিস নিয়ে নাড়াচড়া করে।
 গতানুগতিক মানুষের এক্ষেত্রে অনুভূতিগুলো বর্ণনা করতে গিয়ে
 আপনি হয়ত মানুষের কাছে অতি নীচ মানের ঘটনাবলী তুলে ধরেন।
 কিন্তু আপনি কি তাদের মনে এমন কোন ক্ষুদ্র মোহ সৃষ্টি করতে
 পারেন যা তাদের আত্মার বিকাশ ঘটায়?...না। আপনি দৃঢ় বিশ্বাস
 করেন গতানুগতিকতার জঙ্কাল খঁড়ে তার মধ্যে থেকে সেইসব করুণ ক্ষুদ্র
 ঘটনাবলী খঁজে বার করা প্রয়োজন, যা বলে মানুষ নিছকই শয়তান প্রকৃতির,
 ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও অসৎ। সে সর্বদা সবভাবে ব্যাহ্যিক অবস্থাসমূহের উপরেই
 নির্ভরশীল। সে বীরহীন, হতভাগ্য ও একাকীত্বের মাঝে বিচ্ছিন্ন। আর
 ইতিমধ্যে আপনি জেনে গেছেন যে সেও হয়ত এ বিষয়ে ওয়াকিবখাল হয়ে
 গেছে। কারণ তার আত্মা নিঃপ্রাণ, বুদ্ধি ক্ষুদ্র...। আর এ ছাড়া কি-ই
 বা হবে! বইতে যেভাবে তার চিত্র আঁকা হয় সেভাবেই সে সর্বকিছু দেখে
 কারণ সেই চিত্র রয়েছে সম্বোধনীয় প্রভাব—বিশেষ করে তা বই সেই

কখন কখন হাতে লেখা হয় বা প্রায়ই প্রতিভার প্রকাশ বলে ভুল হয়ে যায় :
 আপনি যেভাবে কোন মানুষের চিত্র আঁকেন, নিজেকে সে ঠিক সেভাবেই
 দেখতে থাকে। আর যখন সে দেখে সে কত খারাপ, ভাল হয়ে ওঠার কোন
 সম্ভাবনা সে আর দেখতে পায় না। আপনি কি তাকে সেই সম্ভাবনা দেখাতে
 পারেন? আপনি কি সেই গৃহ অর্জন করতে পারেন যখন আপনি নিজে...
 না আমি আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি, কারণ আমার ধারণা, আমার কথা শুনতে
 শুনতে আপনি নিজের কাজের সাফাই গাওয়ার ও আমার বক্তব্যকে খণ্ডন
 করার কথা চিন্তা করছিলেন না। শিক্ষক সং হলে তাকে অবশ্যই একজন
 মনযোগী ছাত্র হতে হবে। আপনারা, আজকের শিক্ষকেরা, যা যেন তার চেয়ে
 অনেক বেশী নেন মানুষের কাছ থেকে, কারণ যা-নেই কেবল তার সম্বন্ধেই
 আপনারা কথা বলে যান বেশী, আর যা-নেই তাই কেবল দেখেন আপনারা।
 কিন্তু মানুষেরও বৃদ্ধি আছে; ঠিক যেমন আপনারও নিজের কিছু বৃদ্ধি
 আছে—তাই না? এবং আপনারা নিজেকে শিক্ষক ভেবে নিয়ে, শূভ-এর
 জন্মের পক্ষে অশুভের নিষ্পাকারী ভেবে নিয়ে, কি ভাবে সেই সব সাধারণ,
 ছা-পোষা মানুষ থেকে নিজেকে পৃথক করলেন, যাদের চিত্র আপনারা এত
 নির্ভর ও বিস্তারিতভাবে আঁকেন? কিন্তু আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন যে
 শূভ ও অশুভ কেবলই জটা পাকিয়ে যাচ্ছে, যেভাবে দুটো সাধা ও কালো
 সূতোর গুটি পাশাপাশি থেকে একে অপরের গারে রং ঘসাঘসি করে ধূসর
 বর্ণ হয়ে ওঠে? অবশ্য শূভ ও অশুভের সংগা যেবার যে চেষ্টা আপনারা
 করেছেন তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। না, আপনারা ঈশ্বর-প্রেরিত নন...।
 তিনি আপনাদের চেয়েও কমতালী ব্যক্তি তৈরী করতেন। তিনি তাদের
 হৃদয় জীবন, সভ্য, মানুষের প্রতি উচ্চ ভালবাসা দিয়ে ভরে দিতে পারতেন।
 যাতে তারা অশ্বকারের মাঝে তাঁরই শক্তি ও গৌরবের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা
 হয়ে আমাদের আলো দিতে পারেন...। কিন্তু আপনি শরত্যানের বিজয়-
 মশালের মত ধোঁয়া ছাড়িয়ে জ্বলেন। আপনার ধোঁয়া মানুষের মনে ও প্রাণে
 প্রবেশ করে আত্ম-অবিশ্বাসের বিষে তাদের বিষাক্ত করে তুলছে। সুতরাং
 বলুন : আপনি কি-যানী প্রচার করেন?

আমি গার্ল লোকটার গল্প নিঃশ্বাস অনুভব করছি। তার ক্ষেপে যাতে

আমার স্নেহ না পড়ে সেকল্য অন্যথাকে তাকিরে আছি। আগুনোর কেঁটার মত তার কথাগুলো আমার মস্তিস্কে জ্বলছে, নিদারুণ জ্বালা বোধ করছি...

তার সহজ প্রশ্নটির উত্তর বেওয়া কত কঠিন যুঁজে আমি আতর্কিত, তাই কোন উত্তর বিলাম না।

‘হুতরাং আপনি ও আপনার মত অন্যান্য লেখকেরা যা কিছু লিখেছেন তার একান্ত উৎসাহী পাঠক হিসেবে আমার প্রশ্ন : আপনারা কি উদ্দেশ্যে লেখেন ? আর আপনারা প্রচুর...লেখেন। আপনারা কি মানুষের মনে সময় ভাব জাগাতে চান ? না, শীতল ও বীৰ্যহীন শব্দ ব্যবহার করে কখনই তা করতে পারবেন না ! এং আপনারা মানুষকে নতুন কিছু ভেবে দিতে পারেনই না। পুরনো জিনিসকেও আপনারা ধুমড়ে-মুচড়ে আকারহীন রূপে উপস্থাপিত করেন। আপনাদের লেখা পড়ে আমরা কিছু শিখিও না, কোন কিছু সম্পর্কে লজ্জাও বোধ করি না—যেটুকু লজ্জা বোধ করি তা কেবল আপনাদেরই জন্য। সব কিছুই মামূলি—মামূলি লোকজন, মামূলি চিন্তা, ঘটনা...। কবে মানুষের নির্ভর্যাত মনের ও তার নবজন্মের প্রয়োজনের কথা বলা হবে ? সৃষ্টির আত্মান কোথায় ? সাহসের শিক্ষা কোথায় ? কোথায় সেই আশার বানী যা হৃদয়কে জাগ্রত করে ?

‘আপনি হয়ত উত্তরে বলতে পারেন জীবন সম্পর্কে আপনারা যা কিছু লিখেছেন তা ভিন্ন অন্য কোন চিত্র জীবনে পাওয়া যায় না। কিন্তু তা বলবেন না। কারণ যে মানুষ কথা বলার মতো সৌভাগ্যের অধিকারী তার পক্ষে স্বীকার করা অত্যন্ত লজ্জা ও অপমানের যে জীবনের কাছে সে পরাজিত এবং তার উদ্দেশ্য সে উঠতে অক্ষম। আর যদি আপনারা জীবনের তুরেই ধাঁড়িয়ে থাকেন, যদি কল্পনা-শক্তি বিরে এমন আঙ্গিক সৃষ্টি করতে না পারেন বাস্তব জীবনে যার এখনও দেখা পাওয়া যায় নি অথচ জীবনের নির্দেশক হিসেবে যার প্রয়োজন আছে, তাহলে আপনাদের সৃষ্টি আর কি-কাজে লাগবে ? কিভাবে আপনারা নিজের পেশাকে বৃদ্ধিযুক্ত করবেন ? ভেবে দেখুন, মানুষের মনে তাদের একঘেরে জীবনের আবেদাজে চিত্রের হুবহু ছাপ ফেলে আপনারা কি কর্তাই না করছেন। কারণ নিজেরই স্বীকার করবেন যে আপনারা জীবনের এমন চিত্র অঁকতে অক্ষম, বৈচিত্র্য মানুষের

কসে প্রতিশোধমূলক লজ্জা ও ভিন্নভাবে বঁচার জন্য আকুল কামনার জন্ম
 দেয়...। আপনারা কি জীবনের নীড়ের স্পন্দন দ্রুতভর করতে পারেন ?
 আপনারা কি অন্যদের মত করে জীবনকে উদ্দীপনার অনুপ্রাণিত করতে
 পারেন ?'

আমার এই অচেনা সঙ্গীটি একটু ধম নিল এবং আমি নীরবে তার
 কথাগুলো ভাবতে লাগলাম ।

‘চারিধিকে অনেক বৃক্ষিমান লোক দেখতে পাই। অথচ তাদের
 মধ্যে খুব কম লোকই মহৎপ্রাণ। আর যাদের এই সব অনুভূতি রয়েছে
 তারাও ভয়-স্বপ্ন, মানসিকভাবে অস্থির। এ ছাড়া আমি সব সময়ই একটা
 জিনিস লক্ষ্য করছি, কোন ব্যক্তি যত ভাল, মন তার যত পরিষ্কৃত ও সৎ,
 কোন না কোন কারণে তার উদ্দীপনা তত কম, তার বেঁচে থাকা তত বেদনা-
 ধারক ও কষ্টকর। এইসব ব্যক্তির কপালে আছে একাকিত্ব ও বৃদ্ধি। কোন
 ভাল কাজ করার যতই আকাঙ্ক্ষা থাকুক না কেন, তা করাবার শক্তি তাদের
 নেই। সময় মতো জাগরণী কথা দিয়ে সাহায্য করা হয় নি বলেই কি তারা
 এরকম অবস্থামিত ও অসহায় নন ?’

অচেনা সঙ্গীটি বলে যেতে লাগল, ‘আর তাছাড়াও, আপনারা কি
 এমন আনন্দোচ্ছল হাসি হাসাতে পারেন বা মনকে পরিষ্কার করে ? চারিধিকে
 তাকিয়ে দেখুন ! মানুষ ভালভাবে হাসতে ভুলে গেছে ! তারা হাসে
 তিক্ততার বিষে প্রায়ই চোখের জল ফেলতে ফেলতে। কিন্তু কখনও
 আপনি তাদের আনন্দের হাসি, আন্তরিক হাসি শুনতে পাবেন না।
 আপনি এমন আন্তরিক হাসি শুনতে পাবেন না যা মাঝে মাঝে পূর্ণ-
 বয়স্ক মানুষের মধ্যে থেকে আসা উচিত, কারণ ভাল হাসি আমাদের পরিপূর্ণ
 করে তোলে...। মানুষকে অবশ্যই হাসতে হবে, কারণ পশুদের চেয়ে যে
 সামান্য কটা বেশী সুবিধা সে ভোগ করে হাসি তার মধ্যে একটা। আপনি
 কি মানুষের মনে এমন হাসি জাগাতে পারেন বা নিশ্চয় হাসি নয়, যা
 আপনার প্রতি, হাস্যকরভাবে বিধবস্ত মানুষের প্রতি কটাক্ষপূর্ণ নয় ?
 বৃদ্ধকে চেষ্টা করুন, আপনার শিক্কা বেবার অধিকারের ব্যেপট ভাঁড়ি থাকতে
 হবে। আন্তরিক অনুভূতি জাগ্রত করার ক্ষেত্রে আপনার কথ্যতাই হচ্ছে সেই

ভিত্তি, প্রেরণা ও ক্ষমতা সম্পন্ন এমন আত্মরিক অনুভূতি বা এক ধরনের জীবনকে ধরস করে অন্য ধরনের জীবন, অপেক্ষাকৃত স্বাধীন এক জীবন সৃষ্টি করতে পারে। ক্রোধ, হুঁসা, সাহস, লজ্জা ও অনুভূতির আকস্মিক পরিবর্তন বা ভয়ঙ্কর বেপরোয়া ভাব—এগুলোই হচ্ছে হাতিয়ার যা দিয়ে পৃথিবীর সব কিছু ধরস করা যায়। আপনারা কি এই সব হাতিয়ার তৈরী করতে পারেন? সে গুলোকে কি সক্রিয় করে তুলতে পারেন? মানুষকে উপদেশ দেবার অধিকার অর্জন করতে হ'লে আপনাদের মনে, হয় তাদের হৃদয়ের জন্য প্রচণ্ড হুঁসা, না হয় তাদের হৃদয়ে তাদের প্রতি বিরাট ভালবাসা পোষণ করতে হবে; আর যদি আপনাদের প্রাণে এই রকম কোন অনুভূতি না থাকে, তা হলে আর একবার যথেষ্ট বিনয়ের সাথে ভেবে দেখুন তাদের... বিষয়ে কিছু বলবেন কি না।'

দিনের আলো ফুটেছে, কিন্তু আমার মনে ক্রমেই বেশী বেশী অন্ধকার জমা হচ্ছে। এবং এই যে লোকটি যার কাছে কিছুই গোপন নয়, সে কথা বলেই যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, 'লোকটা কি মানুষ?'

কিন্তু আমি লোকটার কথায় এমন আচ্ছন্ন হয়ে আছি যে এই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ভাববার কোন সময় পেলাম না—তার আগেই আবার তার কথা সূঁচের মত আমার মস্তিষ্কে খোঁচা মারতে আরম্ভ করল।

'জীবন আরও বেশী সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠছে, নতুন নতুন দিকে তার বিস্তার ঘটছে, আরও গভীরে সে আঘাত হানছে, যদিও প্রতিক্রিয়াটি খুব ধীর-গতিসম্পন্ন কারণ তাকে স্বরাস্বিত করবার শক্তিও নেই, দক্ষতাও নেই আমাদের। হ্যাঁ, জীবন বেশী বেশী করে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠছে এবং প্রতি দিন মানুষ প্রসন্ন করতে শিখছে। কে উত্তর দেবে? উত্তর দেওয়া উচিত আপনাদের—আপনারা যারা স্বয়ং-নিষ্পত্ত হ'ত। কিন্তু অন্যকে বোকাবার মত যথেষ্ট ভাল করে কি আপনারা জীবনকে বোঝেন? আপনারা কি আমাদের যুগের দাবিগুলো বোঝেন? ভবিষ্যৎ পরিণতিতে অনুধাবন করার ক্ষমতা কি আপনারদের আছে? এবং যেসব জীবনের আত্মকর্মে বাস বাস করে কলুষিত হয়ে গেছে, যে বিধবৃত্ত ও হতোৎসাহ তাকে জাগ্রত করার জন্য আপনি কি-করতে পারেন? মানুষ হতোৎসাহ, জীবনে তার উল্লাহ

যুব কম, সসম্মানে বেঁচে থাকার কামনা আর প্রায় শেষ ।

সে যেন-তেন-ভাবে শত্রুরের মত বাঁচতে চায় এবং—দুঃখেন ?—

‘আমল’ শব্দটা শুনলেই সে গোঁরাড়ের মত হেসে ওঠে ; মাসে ও মোটা চামড়ার আবরণে মানুষ একটা হাড়ের চিহ্নিত পরিণত হচ্ছে, এবং এই অসং চিহ্নটা আর প্রেরণার দ্বারা চালিত হচ্ছে না, হচ্ছে লালসার দ্বারা । মানুষের প্রতি নজর দেওয়া দরকার । চটপট করুন ! সে মানুষ থাকতে থাকতেই তাকে বাঁচতে সাহায্য করুন ! কিন্তু যখন আপনারাই গোষ্ঠান, আত্মনাথ করেন ও দীর্ঘশ্বাস ফেলেন অথবা নিশ্চিন্ত উদাসীনতা নিয়ে যখন আপনারাই তাদের বিভ্রমের ব্যাখ্যা করেন, তখন তাদের বেঁচে থাকবার কামনা জাগাবার জন্য আপনাদের কি-ই বা করার আছে ? জীবন অবসরের দৃগুশ্চ ছড়ানো ; ভীষণতা ও গোলামীতে হ্রস্ব সম্পূর্ণ ; আলস্যের কোমল বাঁধনে মন ও হাত বাঁধা... । এইসব দুর্নীতির বিশৃঙ্খলার মধ্যে আপনি কোন জিনিস প্রবেশ করাতে চান ? আপনি কত নগনা, কত অসহায় ! আপনারদের মতো আর কজনই বা আছে । ওঃ, যদি জলন্ত হ্রস্ব ও শক্তিশালী সর্ব-বাস্তব মানসিকতা নিয়ে একজন কঠোর, প্রিয় ব্যক্তি আসতেন ! লজ্জাকর নীরবতার এই দুর্ভিত পরিবেশ যদি ভবিষ্যদ্বাণীতে মর্শ্বিত হয়ে উঠত, যদি তা শতাব্দীর মত বাজত, তবেই এই জীবনমৃত্যুর দৃশ্য আত্মগতলোকে কর্মচঞ্চল করে তোলা যেত... ।’

এই কথাগুলো বলে সে দীর্ঘকণ নীরব হয়ে রইল । আমি আর তার দিকে তাকালুম না । এখন ঠিক মনে করতে পারছি না কোনটা বেশী অনুভব করছি—লজ্জা না ভয় ।

‘আমাকে আপনার কি বলার আছে ?’ একটি নিরপেক্ষ প্রশ্ন এল ।

‘কিছু বলার নেই ।’ আমি উত্তর দিলাম ।

আবার নীরবতা নেমে এল ।

‘তাহলে আপনি এখন বাঁচবেন কি ভাবে ?’

‘জানি না ।’ উত্তর দিলাম ।

‘আপনি কি-বলবেন ?’

‘আমি কিছু করতে রইলাম ।’

‘নীলবতার চেয়ে অধিক জানের আর কিছু নেই।’

এই কথাগুলো ও তার পরবর্তী হাসির মধ্যে সময়ের যে কীকটু হয়েছে ভ্যস্ত না জ্বললে যায়। সে খুশীভরে এমনভাবে হেসে উঠল কেন বহুক্ষণ সে এত খোলা মনে ও আনন্দের সাথে হাসবার সুযোগ পায় নি। কিন্তু সেই জঘন্য হাসি আমার হৃদয়কে কত বিকৃত করে দিল।

‘হাঃ, হাঃ ! আর আপনিই হচ্ছেন কিনা জীবনের অন্যতম শিক্ষক, যে আপনি এত সহজেই বিভ্রান্ত হয়ে যান ? হাঃ, হাঃ, হাঃ...এবং বুদ্ধবুদ্ধ, আপনারা বারা জন্ম-বৃত্ত, আপনারা প্রত্যেকেই যদি আমার সাথে কথা বলতে রাজী হন তাহলে একইভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন। যে মিথ্যা, গোঁড়াভূমি ও লম্বাহীনতার বর্মে নিজেকে ঢেকে ফেলেছে, কেবলমাত্র সে-ই তার নিজের বিবেকের বিচারের কাছে অবিচলিত থাকবে। সুতরাং এই হচ্ছে আপনার শক্তি—একটি মাত্র ধাক্কাতেই পতন। কি হল, কিছু বলুন, আশ্চর্য্যের জন্য কিছু বলুন ; আমার কথা শুনুন করুন। লম্বা ও অনুশোচনা থেকে নিজের মনকে মুক্ত করুন। করণের জন্য হলেও নিজের কিছু শক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয় দিন, তা হলেই আমি আপনার মূখের উপরে যেসব কথা ছুঁড়ে দি রেছিলাম সেসব ফিরিয়ে নেব। আমি আপনার কাছে মাথা নত করব...। আপনি প্রমাণ করুন যে আপনার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে বার বারা আমি আপনাকে শিক্ষক হিসাবে মেনে নিতে পারি। আমিও একজন শিক্ষক চাই, কারণ আমিও মান্দব ; আমি জীবনের অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেছি। আলো, সত্য, স্বপ্ন ও নতুন জীবনের পথ খুঁজছি—পথ যেখান ! আমিও একজন মান্দব। আমাকে মারুন, ধুপা করুন, কিন্তু জীবনের প্রতি এই উদাসীনতার পিচ্ছিল মাটি থেকে টেনে বার করে নিয়ে যান। আমি বা আমি তার থেকে ভাল হতে চাই ; কি করে তা করা যায় ? শিখিয়ে দিন কি ভাবে সম্ভব !’

আমি ভাবি : এই লোকটা যেভাবে আমাকে তার কাঁধে পুরণ করতে বলছে, ব্যর্থব্যর্থভাবে কি তা আমি করতে পারি ? আমি কি তা করতে পারব ? জীবন সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, মান্দবের মন সর্ববর্মান সম্বন্ধে জেলে গেছে। একটা রাত্তা খুঁজে বার করতেই হবে। কোথায় সেই রাত্তা ?

আমি শব্দ এইটাই জানি কেবলমাত্র সুখের জন্যই কারো সচেতন হলে চলবে না। কেন শব্দ সুখের জন্য সচেতন হওয়া? এর মধ্যে জীবনের উদ্দেশ্য নিহিত নেই এবং কাম্পিত-আত্মতৃপ্তির দ্বারা মানুষ কখনই সন্তুষ্ট হবে না; অন্ততঃ সে এর উদ্দেশ্য। সুখের ও সাক্ষ্যের শক্তির মধ্যেই জীবনের অর্থ বিদ্যমান, আর আমাদের আত্মতার প্রতিটি মূহুর্তেরই থাকবে উচ্চ লক্ষ্য। তা হওয়া সম্ভব। কিন্তু জীবনের পুরাতন চৌহাঙ্গির মধ্যে নয়, কারণ তা এতই সংকীর্ণ যে সেখানে সকলের সংকুলান হবে না, সেখানে মানবাত্মার কোন স্বাধীনতা নেই...

সে আবার হাসছে, কিন্তু এখন মৃদুভাবে; এ হাসি এমন একজন লোকের হাসি যার হৃদয় চিন্তার ক্ষতিবিক্ষত।

‘এ পৃথিবীতে কত লোক জন্মেছেন, অথচ মনে রাখবার মত কোন অবধান রেখে গেছেন এমন লোকের সংখ্যা কত কম! কেন এমন হল? তবুও আমরা অতীতের জয়গান গাই—অতীত কতই না ঈর্ষা জাগ্রত করে। মৃত্যুর পরেও চিহ্ন রেখে যাবার মত কেউ নেই। মানুষ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন—কেউ তাকে জাগাতে চায় না। ঘুমিয়ে থাকতে থাকতে সে পশুতে পরিণত হয়ে বাজে। এখন দরকার চাবুক মারা এবং তারপর চাবুক রেখে উদ্ভাস ভালবাসা দেওয়া। তাকে আঘাত করতে ভয় পাবেন না; যদি ভালবাসা দিয়ে আঘাত করেন সেও আপনার আঘাত বৃদ্ধিতে পারবে এবং সেই আঘাতকে নিজের প্রাপ্য হিসাবেই নেবে। এবং যখন সে নিজের লক্ষ্য ও বশ্তগার কুঁকরে উঠবে, তখন তার প্রতি আন্তরিক যত্ন নিতে হবে, আর তখনই ঘটেবে তার পুনর্জন্ম...। জনগণ? মাকেমাঝে তাদের অপকর্ম ও চিন্তার বিকৃতির দ্বারা আমাদের বিন্মিত করলেও তারা এখনও শিশু। সর্বদাই তাদের ভালবাসার, তাদের আত্মার জন্য সজীব ও স্বাভাবিক খাবার যোগান দেওয়া প্রয়োজন...। আপনি কি মানুষকে ভালবাসতে পারেন?’

‘মানুষকে ভালবাসা?’ আমি সম্বেদনের কথাটার পুনরাবৃত্তি করলাম, কারণ সত্যিই জানি না আমি তাদের ভালবাসি কিনা। আর এখন একনিষ্ঠ হতে পারব না, আমি জানি না। কে নিজের হর বলতে পারে? আমি

মানুষকে ভালবাসি। যে কোন লোক, যে নিজেকে সঠিকভাবে লক্ষ্য করে, এই প্রস্নের উত্তরে হ্যাঁ করতে গিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবে। আমরা সবসময় জানি আমাদের আত্মীয়-স্বজনদেরা প্রত্যেকের কাছ থেকে কত দূরে।

‘আপনি চুপ করে আছেন? কিন্তু যদিও আপনার বলার কিছুই নেই, আমি আপনাকে বুঝতে পারছি...। আর এখন আমি আপনার কাছ থেকে বিদায় নেব।’

‘এর মতোই?’ আমি নম্রভাবে জিজ্ঞেস করলাম, কারণ তাকে ভয় পেলেও নিজেকে ভয় পাচ্ছি আরও অনেক বেশী।

‘হ্যাঁ এখন আপনার কাছ থেকে বিদায় নেব...। আমি আবার আসব এবং শুধু যে একবারই আসব তা নয় কিন্তু। অপেক্ষা করুন!’

সে চলে গেল।

কিভাবে সে গেল? তাকে দেখতে পেলাম না। ছায়ার মত দ্রুত, নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল...। আমি বহুক্ষণ পাকের বেগে বসে রইলাম। ঠান্ডার কথা খেয়াল নেই। সূর্য উঠেছে, গাছের বরফ-ঢাকা ডালপালার উপর যে আলো ঝলমল করছে এই ঘটনার দিকেও খেয়াল নেই। এই পরিস্কার দিনটি দেখে, আগের মতই সূর্যের এই উদাসীন আলোর ছটা দেখে এবং সূর্যের আলোর অসহনীয় ঝলমলে তুষারের কম্বলে ঢাকা এই প্রাচীন যন্ত্রণাক্রান্ত পৃথিবীকে দেখে আমার অচেনা লাগছে।

প্রথম প্রেম

আমার শিকারে সম্পূর্ণ করার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই ভাগ্য আমার প্রথম প্রেমের বশতাময় অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আমার প্রথম প্রেম ছিল বিরহ-মিলনের আলো-ছায়ার ঘেরা।

বন্দুকা কয়েকজন মিলে ওকা নদীতে নৌকা বাইবার আয়োজন করেছিল। কি 'ক' ও তার স্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানোর হারিষ পড়েছিল আমরাই উপরে। সম্প্রতি ফ্রান্স থেকে ফিরেছে এই সম্প্রতি—এবের আগে কখনও ঘোষিনি। সন্তোষবোলা তাদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

একটা পুরোনো বাড়ির মাটির-তলার ঘরে তারা থাকে। বাড়িটার সামনে, রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত, সারা বসন্তকাল ও গ্রীষ্মের প্রায় সবসময়ই জল জমে থাকে। কাক ও কুকুর সেই জমা-জলে মূখ ঘেঁষে, আর শূরোরেরা স্নান করে।

এমনই আনমনা ছিলাম যে হুড়মুড় করে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলাম—অন্যর বিরক্তির বিষয়টা খেয়ালই ছিল না। একটি নাহুস-নুহুস লোক বাঁকা ভদ্রুতে দেখা করতে বেরিয়ে এল। লোকটির উচ্চতা মাঝারি, গালভর্তি ঘন বাফামী দাড়ি, কিন্তু নীল চোখজোড়া বেশ প্রসন্ন। দরজা আড়াল করে সে আমার সামনে দাঁড়াল। পোষাক ঠিক করতে কঠখোটা গলার বলে উঠল, 'কি চাই?' তারপরই ধমকের সুরে বলল, 'বাড়িতে ঢোকার আগে কড়া নাড়া উচিত।'।

লোকটার পেছনে, ঘরের আবছা আলোর, বড় সাবা পাখীর মতো কিছু একটা দেখতে পেলাম—পাখীটা বেন ছটফট করছে। আর তারপরই একটা পরিষ্কার, প্রাণোজ্বল কঠম্বর ভেসে এল :

'বিশেষ করে কোন বিবাহিত সম্প্রতির বাড়িতে এলে।'

আমি বিরক্তিরে জিজ্ঞাস করলাম, তুমিই আমার লক্ষ্য-ব্যক্তি কিনা। দাঁতালো ব্যবসারীর বন্দ নিয়ে লোকটা যখন আমার নিশ্চিত করল যে তারাই সেই ব্যক্তি, বুঝিয়ে বললাম কেন এসেছি।

'কি বললে, লাক' ভোমার পাঠিয়েছে?' লোকটা গভীরভাবে দাঁড়িয়ে

হাত বোলাতে বোলাতে কথাটা পুনরাবৃত্তি করল। হঠাৎ চিংকার করে বলে উঠল, 'উঃ ! ওলোমা !' এবং শরীরের সেই অংশটা ছেপে ধরে উজাসে কয়েক বার ঘুরপাক খেল বা ভরসমাজে উচ্চারণ করা বার না। মনে হ'ল সে যেন ওখানে চিমাটি খেয়েছে।

বরজার লোকটার জরগার এসে বঁড়াল একটি ছিপছিপে ভাবী মেয়ে। হাসিভরা নীলচোখে সে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল।

'তুমি কে ? পদ্মিণি ?'

'না না। আমার প্যান্টটাই ঝরকম।' আমি বিনম্র উত্তর দিলাম।

সে হাসল। কিন্তু আমি রাগ করতে পারলাম না, কারণ তার চোখে যে ব্যক্তি কুটে উঠেছে, বহুদিন ধরে যেন তারই সম্মানে ছিলাম। আমার পোশাকেই যে তার হাসি পেয়েছে, তা ঠিক। আমার পরনে রয়েছে ফুলপ্যান্ট ও সাধা বাবুচি-জ্যাকেট। পোশাকের মধ্যে জ্যাকেটই সবচেয়ে সুবিধাজনক। স্ট্রট-কোটের পরিবর্তে পরা বার, আর গলা অর্থাৎ বোতাম লাগালে ভালো জামা না পরলেও চলে। সাথে ধার-করা শিকারের বড় এবং ইতালীর গুন্ডামের মতো চওড়া টুপি থাকার বোলকলা পূর্ণ হয়েছে।

মেরেটি আমার কনুইয়ের কাছে হাতা ধরে টেনে ধরে নিয়ে গিয়ে টেবিলের দিকে ঠেলে দিল।

'এমন উদ্ভট পোশাক পরেছ কেন ?' সে প্রশ্ন করল।

'উদ্ভট ? কেন ?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, রাগ করতে হবে না।' সে অনুনয় করে বলল।

কি অদ্ভুত মেয়েরে বাবা ! এর উপর দাগ করে কার সাখ্যি ? বাড়িওয়ালা লোকটা বিছানার বসে সিগারেট পাকাচ্ছে। চোখের ইশারার তাকে ঘোঁষরে প্রশ্ন করলাম : 'বাবা, না ভাই ?'

'ওর স্বামী,' লোকটা নিজেই জবাব দিল। আর মেরেটি হেসে বলল, 'এ প্রশ্ন কেন ?'

এক লহমার মেরেটির মূখের ভাব লক্ষ্য করে বললাম, 'মাপ কর !'

আমরা আরও মিনিট পাঁচেক এলোমেলো কথা চালালাম। আমি কিন্তু যদুই শব্দই বোঝে করছিলাম, এবং মনে হল যেহেতু এই নীচের-ভালার ধরে

পাঁচ ঘণ্টা, পাঁচ দিন বা বছরের পর বছর যসে তার সুন্দর ভিখারীত্ব হৃদয় ও মন্থিত চোখের অথবা পান করে কাটিয়ে দিতে পারি। তার ছোট্ট মূখের নীচের চোঁটটা ওপরের চেয়ে বেশী পুরু, —মনে হয় ইকং ফোলা। বাবানী বয়সের ঘন চুল রিপ এঁটে ছোট করা হয়েছে। শামুকের খোলার মতো তার খোঁপা কান ও গোলাপী গালের পাল দিয়ে ঘুরে মাথার উপরে হালকা টুপি'র মতো বসে আছে। তার হাত ও বাহু অনির্বচনীয়; বরজার চোকট ধরে বাড়ানোর কলে কনুই অবধি নয় বাহু দেখতে পেলাম। মেরেটির পোশাক অত্যন্ত সাধারণ—কোমর পর্যন্ত ফুলহাতা সাধা সার্ট, হাতার প্রান্তে বুলছে লেস আর আছে অত্যন্ত মানানসই সাধা স্কার্ট। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তার চোখজোড়া। সেই চোখ থেকে কি আনন্দ, সমবেদনা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ কৌতুহলই না বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এবং তারও উপরে, সেই চোখজোড়া ঠিক সেই হাসিতেই উজ্জ্বল (এই বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না!) বার জন্য একটি কুড়ি বছরের বৃদ্ধক আকুল কামনা করে, বিশেষতঃ বার ছয় বার বাস্তবের টানাপোড়নে ক্ষতিবিক্ষিত।

‘এখনি বৃষ্টি নামবে’, তার স্বামীটি বাড়িতে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে জানান দিল।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম। আকাশ পরিষ্কার ও নক্ষত্র-খচিত। উঠবার ইঙ্গিতটা বৃদ্ধকে পেরে চলে এলাম। কিন্তু বীর্ষ আকাঙ্ক্ষিত কামনার খন পেলে কোন ব্যক্তি যে প্রশান্ত আনন্দ লাভ করে, আমি সেই আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেছি।

সারারাত ধরে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়িয়ে সেই কোমল নীল চোখের বৃষ্টির স্মৃতি রোমন্বন করলাম। সকালে এই প্রত্যয় জন্মাল যে বাড়িওয়ালার খাদ্য-পরিভোক্ত মার্জারের নিম্পূর্ণ-বৃষ্টিসম্পন্ন ঐ দ্রুতপদে বিশাল বপুটি তার স্বামী হবার যোগ্য নয়। সত্যি কথা বলতে কি, আমি তার জন্য দুঃখ বোধ করলাম, হায় হতভাগিনী! ঐ রকম একটা লোকের সাথে ঘর করার কথা চিন্তাই করা যায় না বার বাড়িতে রুটির গর্ভে আটকে থাকে।

পরের দিন আমরা অশ্বকারাজের ওকা নদীতে নৌকা বাইতে গেলাম। ওকা নদীর দুই পাড় অনেক উঁচু। নানা রঙে চিত্রাবচিত মাটির ত্বরের

ভেরা-বাসে ভরা। সূর্যের আবির্ভাব থেকে এটাই ছিল স্বপ্নরতন দিন।
 উৎসবমুখর আকাশে সূর্য আলো ছড়ানি, নদীর বাতাসে ভেসে বেড়ানি
 পাকা স্ট্রবেরীজের মিষ্টি গন্ধ, মানুষেরা নিজেদের সদাসরতা সম্পর্কে
 সচেতন হয়ে উঠেছিল, আর তার ফলে আমার মন তাদের প্রতি ভালবাসা ও
 আনন্দে ভরপুর হয়ে গিয়েছিল। এমন কি আমার প্রেমিকার স্বামীটিও
 অতি চমৎকার মানুষে পরিণত হয়ে উঠেছে। স্ত্রীর নোকায় সে ওঠেনি,
 নোকাটা আমিই বাইছিলাম। সারাদিন সে নল ব্যবহার করেছে। প্রকৃত
 সে আমাদের গ্যাডস্টোন সম্পর্কে মজার মজার গল্প বলে, তারপর এক মগ
 সুস্বাদু দুধ খেয়ে একটা গাছের নীচে টানটান শব্দে শিশুর মতো রাত অবধি
 ঘুমোয়।

স্বাভাবিকভাবে আমাদের নোকাটাই পিকনিক-এর জায়গায় সবার আগে
 এসে পৌঁছায় এবং আমার আরাধ্যাকে কোলে করে নামিয়ে আনতেই সে
 বলল :

‘তোমার কি শক্তি!’

মনে হল আমি সর্বোচ্চ গিজটিকেও উপড়ে ফেলতে পারব। তাকে বললাম
 যে আমি অনায়াসে তাকে কোলে করে শহরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি।
 (শহর এখান থেকে সাত ভাস্টের কম নয়)। নিশ্চিত করে বলতে পারি না
 আমি সত্যি এতখানি বীরত্বপূর্ণ কাজ করতে পারব কি না। সে মিষ্টি
 হেসে অপাঙ্গে আমার শরীরে দৃষ্টি বুলিয়ে দিল। সারাদিন তার চোখের
 দ্বারা সম্পর্কে সচেতন হয়ে রইলাম, এবং হলফ করে বলতে পারি তার
 চোখের সেই উজ্জ্বলতা ছিল কেবল আমারই জন্য।

ঘটনা দ্রুত এগোতে লাগল, আর সেটা আশ্চর্যেরও কিছু নয়। কারণ
 এই বদ্বতী নারী আগে কখনও এমন আশ্চর্য জন্তু দেখেনি, এবং জন্তুটিও
 সেই নারীর আশ্রয় পাবার জন্য আঁকড়ে পড়ে আছে।

কয়েক দিনের মধ্যেই জানতে পারলাম, দেখতে পূর্ণবোঁবা হলো সে
 আমার চেয়ে দশ বছরের বড়। বেলোস্টকের স্কুল অব ইয়াং ওমেন অব দি
 নোবিলিটি থেকে গ্রাজুয়েট হয়েছে। সে পিটার্সবার্গের উইস্টার প্যালেসের
 এক কম্প্যাড্রাস্টের সংগে প্রণয়বান্ধ ছিল, প্যারিসে বসবাস করেছে, এবং
 চিত্রকলা ও ধার্মিকতা নিয়ে পড়াশুনা করেছে। পরে আরও জানা গেল, তার

মা-ও একজন ধাত্রীবিন্দু ছিলেন এবং তিনিই আমার এই পৃথিবীতে আনার সাহায্য করেছিলেন। আমি এই ঘটনাটির শব্দ ইঙ্গিত পেয়ে আনন্দিত হয়ে উঠি।

বোহেমিয় ও রাজনৈতিক দেশান্তরীদের সাথে তার সংহতি, জনৈক রাজনৈতিক দেশান্তরীর সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, নীচের-ভলার যের তাবের অধীহার অর্ধ-বাবার জীবন এবং প্যারিস, পিটার্সবার্গ ও ভিয়েনার স্ফুটন, কৃষ্টি তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে বেশ মজার অস্থিরতা এবং অসাধারণ আকর্ষণ এনে দিয়েছে। উঠতি যুবতীর মতোই সে প্রগলভ। চতুর ক্ষুধার মেয়ের কোঁড়ুল নিয়েই সে জীবনকে, মান্দকে দেখে। যথেষ্ট আবেগ দিয়ে ফরাসী গান গায়। স্ফুটন, ভঙ্গিতে সিগারেট খায়, বন্ধতার সাথে ছবি আঁকে, অভিনেত্রী হিসেবেও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে এবং পোশাক ও টুপি বানানোর সুদক্ষ কারিগর। কেবল ধাত্রীবিন্দুর নিয়েই কোন চর্চা করেনি।

‘আমি সারা জীবনে মাত্র চারটি রুগী পেরেছি এবং তাদের বারো আনাই মরে গেছে’, সে বলেছিল।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরোক্ষ সাহায্যের প্রতি তার সার্বিক অনীহার এটাই যথেষ্ট কারণ ছিল। আর প্রত্যক্ষ সাহায্যের ক্ষেত্রে একটি চার বছরের চমৎকার মেয়েই হচ্ছে তার এই বিষয়ে সম্বোধিত যোগ্যতার প্রমাণ। সে যখন নিজের সম্বন্ধে বলে তখন মনে হয় এমন একজনের সম্পর্কে বলছে যাকে সে ঘনিষ্ঠভাবে চেনে, যার সম্পর্কে সে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে পড়েছে। কখনও কখনও এমন মনে হয় যে সে তাকে বিস্মিত করে তুলেছে : তার চোখজোড়া চমৎকারভাবে কালো হয়ে ওঠে, এবং তার গভীরে খেলে যার মূহুর্ত সলজ্জ হাসি। লাজুক শিশুরা এভাবেই হাসে।

তার মৃত-অনুরাগী হয়ে ওঠা মন সম্পর্কে আমি সচেতন। সে যে আমার চেয়ে বেশী দীক্ষিতা তা জানি। আর পারিপার্শ্বিক মান্দবন্ধনের সাথে যে-উদার প্রসন্নতা নিয়ে সে মেলামেশা করে তাতে আমি বিস্মিত। আজ পর্যন্ত বত মেয়ে বা মহিলার সাথে পারিচিত হয়েছি, সে তাদের প্রত্যেকের চেয়ে লক্ষণে বেশী আকর্ষণীয়। বেরকম সহজভাবে সে আমার

সাথে গল্প করে তরুণ মৃদু হইয়া বাই। আর তা আমার মনে এমন বিশ্বাস
এনে দেয় যে মনে হয়, আমার বিপ্লবী-মনোভাবাপন্ন বন্ধুদের জ্ঞানভান্ডারের
সব তার আয়ত্রে, উপরন্তু তার ভান্ডারে রয়েছে আরও বেশী কিছু সম্পদ।
সেই জ্ঞান আরও বেশী কিছু, আরও বেশী মূল্যবান। ফলে বরষক লোকেরা
কেমন শিশুদের মজার খেলা, বিপজ্জনক খেলাও, হাসিমুখে লক্ষ্য করে,
ভেতন হাসি মৃদু স্নেহে দর্শকের মতো সবকিছু ঘুরে থেকেই লক্ষ্য করত।

নীচের-তলার তার থাকবার কোয়ার্টার্স-এ ছিল মাত্র দুটো ঘর। একটা
ছোট রান্নাঘর, যেটা দিয়েই ভেতরের ঘরে ঢুকতে হয়, আর একটা বড় ঘর।
বড় ঘরটার তিনটে জানলা রয়েছে রাস্তার দিকে এবং বাকি দুটো আবজর্না-
পূর্ণ একটা উঠানের দিকে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে কোন মন্দির
কাছে হয়ত ঐ কোয়ার্টার্স খুবই আরামদায়ক হতে পারে, কিন্তু তার মত
একজন মহারসী নারীর কাছে আদৌ তা নয়। সে তো বিপ্লবের ঐতিহ্য,
মল্লিয়ার, বিউমারচাইস, হুগো প্রমুখের পবিত্র নগরী প্যারিসে বসবাস করে
এসেছে। ছবি ও ছবির স্ক্রেনের মধ্যে এরকম বৈষম্য আরও অনেক ছিল।
এ সমস্ত কিছুই আমার বিরক্তি উদ্বেগ করছিল এবং অন্যান্য অনদ্ভূতির মধ্যে
তা আমার মনে এই মহিলার প্রতি সমবেদনার অনদ্ভূতিও জাগ্রত করে।
অথচ যেসব বিষয়ে তার গভীরভাবে বেদনাক্লান্ত হওয়া উচিত বলে আমার মনে
হয়েছে, সেসব বিষয়ে সে নিজেকে ছিল সম্পূর্ণই উদাসীন।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে ব্যস্ত থাকত। সকালে করত রান্নাবান্না
ও ঘরের কাজ। তারপর জানলার নীচে বড় টেবিলে বসে হয় শহরের
বিখ্যাত লোকদের ফটো দেখে পোস্টালের ছবি আঁকা, না হয় ম্যাপ এঁকে
রঙ করা, অথবা স্বামীকে গ্রামীন সংখ্যাতন্ত্রের বই সংকলনে সাহায্য করা।
রাস্তার ধুলো-ময়লা খোলা জানলা দিয়ে উড়ে এসে পড়ত তার মাথার,
টেবিলে এবং পাখকের পায়ের কালো ছায়া পড়ত তার কাগজপত্রে। সে
কাজ করতে করতে গান গায় এবং বসে থেকে থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়লে উঠে
পড়ে ও চেয়ার ঘিরে গুলালজ নৃত্য করে বা মেয়ের সাথে খেলার মেতে
ওঠে। এতসব নোংরা কাজকর্ম করা সত্ত্বেও সে সবসময়ই বিভ্রালহানার
মত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

তার স্বামীটি কর্ডে ও গোছোরা । শোবার সময় ক্রাসী উপন্যাস পড়ে, বিশেষ করে ডুমাস পেরির । লোকটি বলে, ‘এগুলো তোমাদের মস্তিস্কের ঝিলকোব থেকে আবির্ভাব পাওয়ার কল্পে দেবো’ সে জীবনকে দেখে, ‘সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে’ । রাতের খাওয়ার পরে, ‘পদটির আত্মহরণ’ এবং খাওয়া হয়ে গেলে বলে ওঠে :

‘বাবাকে পাকস্থলী থেকে শরীরের কোষে কোষে পরিবাহিত করতে হলে সমস্ত প্রণালীটাকে পুরোপুরি বিচ্যুত দেওয়া বরকার ।’

আর তাই সে বিজ্ঞানায় গিয়ে ওঠে এবং ঘাড় থেকে রুটির টুকরোগুলো পর্বত না ঝেড়ে কয়েক মিনিটের জন্য ডুমাস অথবা ডি মন্টিগিন পড়ে এবং পরবর্তী ঘণ্টা দুইয়ের নাক ডেকে মহাসুখে ঘুম লাগায় । ফলে তার নরম গোঁফজোড়া নড়েনড়ে ওঠে, মনে হয় যেন কোন অদৃশ্য পোকা ওখানে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে । ঘুম থেকে উঠে কিছুক্ষণ ছাঁবের ফাটলের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে থেকেই বলে ওঠে :

‘গতরাতে কুজমা, পারনেল-এর চিন্তাধারার একটা ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছিল ।’

আর তার ঠিক পরেই কুজমার ভুল ভাঙ্গিয়ে দেবার জন্য সে যাত্রা করে এবং বাবার আগে স্ত্রীকে বলে যায় : ‘তুমি সেইডান ভোলন্ট-এর সংখ্যাগুলোর হিসেব করে রেখো না গো ! আমি বাবো আর আসব ।’

মধ্যরাত বা তারও পরে সে উৎফুল্ল চিত্তে ঘিরে আসে ।

‘আমি কুজমাকে আগেই বলেছিলাম । ওর স্মরণশক্তি আছে ঠিক, কিন্তু আমরাও কম নেই । আর হ্যাঁ, ও গ্র্যাডস্টেনের প্রাচ্য-নীতির প্রাথমিক কথাটাই বোঝে নি ।’

সবসময়ই সে বিনেট বিচেট এবং মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলে, আর কখনও বস্তুতে আটকে ঘরে থাকলে স্ত্রীর শিক্ষকন্যাটিকে পড়াতে বসে যায় । কন্যাটি দুটো প্রেমের মাঝপথে কোন এক সময় হঠাৎই জন্মেছিল ।

‘লোলিতা, সবসময় খাবার ভাল করে চিবিয়ে খাব, খেঁচবি হজম ভাল হবে । কারণ, ভাল করে চিবালে খাদ্য রাসায়নিক মস্তিষ্ক পরিণত হয়ে শরীরে মিশে যায় ।’

রাতের খাওয়া সম্পন্ন হলে সে নিজের পরিণাক প্রণালীটিকে ‘সম্পূর্ণ’

বিভিন্ন দেশের অবস্থান নিয়ে আসে। শিশুটিকে নিজের বিছানায় তুলে নিয়ে গল্প-কলার মতো করে করতে শুরু করে :

‘আর তাই যখন দাঁড়িক ও রক্তলোলুপ নেপোলিয়ান ক্ষমতা বঞ্চল করল...’

বক্তৃতা শুনে তো তার স্ত্রী হেসে খুন, কিন্তু সে কিছুর মনে করে না— রাগ করার আগেই ঘুমিয়ে ঢলে পড়ে। তার সিলেক্টর মতো কোমল গেমিকজোড়া নিয়ে কিছুক্ষণ খেলে শিশুকণ্যাটি গুটিসুঁটি মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আমি কিন্তু মেরেটির পরম বন্ধু হয়ে উঠি। রক্ত-লোলুপ ক্ষমতা-বঞ্চলকারী এবং তার হস্তভাগা জোসেফিনের উপরে বোলেন্সভের বক্তৃতার চেয়েও অনেক বেশী করে যখন আমি তাকে গল্পটা শোনাই, সে বেশ উপভোগ করে। আমার সাফল্যে বোলেন্সভ অশ্রুত রক্ত ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে।

‘আমার আপত্তি আছে, পেশকভ ! জীবনের সম্পর্কে আমার আগে শিশুকে অবশ্যই জীবনের মূল লক্ষ্যগুলো সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে। বদভাগ্য যে তুমি ইংরিজি জানো না, জানলে ‘শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য...’ বইটি পড়তে পারতে।’

আমার সন্দেহ, সে ইংরিজির কেবলমাত্র একটি শব্দই জানে, ‘গুড বাই’।

সে বললে আমার ষিগুণ অথচ ছোট পোষা কুকুরের মতোই তার অনুসন্ধিৎসা। সে আত্মা মারতে ভালবাসত, আর ভালবাসত লোকের মনে এমন একটা ধারণা জন্মাতে যে সে বিদেশ ও রাশিয়ার সমস্ত বিপ্লবী বলের গোপন খবরই রাখে। হয়ত সে তাদের চেনেও বা, কারণ সবসময়ই তার কাছে অশ্রুত সব অচেনা লোকজন আসত। আর তারা এমন ভাব-ভাব করত, যে মনে হত তারা এক একজন মহান ট্রাজেডিয়ান কিন্তু বর্তমানে বাধ্য হয়ে বোকা সেজে থাকছে। তার বাড়িতেই আমি বিপ্লবী সাবুনারেভকে দেখতে পেরেছিলাম। পুলিশের থেকে আত্মগোপন করার জন্য সে পরত বেথাপ্পা খরনের লাল রংয়ের পরচুলা এবং তার রঙেরে স্ট্রাটস হাঙ্গারভাবে গারে এঁটে থাকত।

একদিন সেখানে পেঁছে একজন খুঁজে গবেশিত লোককে দেখতে পেলাম। লোকটার মাথা ছোট এবং দেখতে নাপিতের মতো। পরনে

ছিল চেককাটা প্যাস্ট, ঘুসর ঘরের জ্যাকেট এবং মচমচে জুতো । বোলেন্স্লাভ আমাকে খাড়া দ্বিগুণে রাখা ঘরে নিয়ে গিয়ে কিসকিস করে বলছিলেন :

‘খুব জরুরী খবর নিয়ে লোকটা এইমাত্র প্যারিস থেকে এসেছে । তাকে কোরোলেন্সকোর সাথে দেখা করতে হবে ; একটু ব্যকহা করে দাও ভাই ।’

আমি চেষ্টা করেছিলাম । ফল হয়েছিল এই যে কোরোলেন্সকোকে রাস্তার ধরে বখন লোকটিকে চিহ্নিত করে তার উদ্দেশ্য বলেছিলাম, তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় আমাকে বলেছিলেন :

‘না না । ধন্যবাদ । ঐ আশ্রয়স্থল লোকটার সাথে আমার কোন দরকার থাকতে পারে না ।’

বোলেন্স্লাভ এটাকে সেই প্যারিসবাসী ও ‘আদর্শের’ প্রতি অপমান হিসাবেই দেখেছিল । পরের দু দিন সে কোরোলেন্সকোর কাছে প্রতিবাদপত্র লিখতেই কাটিয়ে দিল, একবার সক্রোধ নিষ্পামিত ভাষায়, একবার বিনম্র ধমকের সুরে, এবং সবশেষে চিঠি লেখার সমস্ত প্রচেষ্টাই উনুনে পাঠিয়ে দাঙ হল । এর ঠিক পরেই মস্কো, নিজ্‌নি নভগোরড, এবং ভ্লাডিমিরে একের পর এক স্বেচ্ছায় শত্রু হয় । খবরে প্রকাশ যে ঐ চেককাটা ফুলপ্যাস্ট-পরিহিত লোকটিই বিখ্যাত ল্যান্ডেজেন গারটিং । সেই প্রথম আমি পদলিখের চর প্রত্যক্ষ করলাম ।

কিন্তু সর্বকিন্তু মিলিয়ে, আমার প্রেরসীর স্বামীটি ভাল মানদুৰ, কিছুটা অভিমানী এবং ‘বিজ্ঞানের কুলির’ বোকার কিছুটা হাস্যকর । সে নিজেই বলে :

‘বুদ্ধিজীবীর বেঁচে থাকার একমাত্র যুক্তি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সঞ্চার করা এবং ব্যক্তিগত লাভালাভের কথা চিন্তা না করে সেই জ্ঞান জনগণের মধ্যে বিলি করা ।’

ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে আমার হৃদয়ের টানাপোড়েনও বাড়তে থাকে । সেই নীচের-স্তলার ঘরে বসে বখনই ঘোঁষে যে আমার প্রেরসী তার কাজের টেবিলের উপর বসে পড়েছে, একটা অব্যব ইচ্ছা আমার পুরে বসে । ইচ্ছা করে তাকে পাকাকাল করে তুলে নিই এবং এই বড় ডবল-বেড খাট, পুরোণো আমলের ভারী ডিভান বার উপরে বাচ্চাটা ঘুমাতে, ঘুলো-জমা কই ও

কালজগতের বোকাই চৌকিল দিয়ে ঠাণ্ডা এই জঘন্য ঘর থেকে তাকে অন্য কোথাও নিয়ে বাই। জানলা দিয়ে মাঝেই মাঝেই লোকজনের পা বিস্তীর্ণাবে নজরে পড়ে, একটা দ্রাস্তার কুকুর প্রায়ই সেখান দিয়ে মৃদু গলার; বাতাসে রৌদ্রতপ্ত ধুলোর পর্দীতগন্ধ ভেসে আসে। ঘরের ভিতরের দৃশ্যটা হচ্ছে এই রকম—গুমোট বাতাস, চৌকিলের সামনে একটি কিশোরী-প্রতীম শরীর, তার আনমনা গান, তার পেন বা পেন্সিলের আঁচড়ের শব্দ, বৃন্দা ফুলের মতো নীল চোখের হাসি বা শব্দ আমারই অন্য মনোভূতের তরে উত্তোলিত হয়...। আমি তাকে উদ্ভাসের মতো ভালবাসতে শব্দ করি—তার দৃষ্টিতে ভারাক্রান্ত হই।

‘নিজের সম্পর্কে আরও কিছু বল,’ সে একদিন আমার বলল।

আমি বলতে শব্দ করার কয়েক মনোভূত পরেই সে বৃন্দাতে পেরে আমার ধামিয়ে দিল :

‘নিজের সম্পর্কে বলছ না কিন্তু।’

খুব ভালভাবেই জানতাম যে নিজের সম্পর্কে বলছি না, বলছি এমন একজনের সম্পর্কে যাকে আমি নিজের সাথে গুলিয়ে ফেলেছি।

বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা ও অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে তখনও নিজের প্রকৃতি সত্য-টিকে আমি খুঁজে পাই নি। তখনও সেটা খুঁজে দেখতে অপরাগ ছিলাম, কিংবা ভয়ই পেতাম। আমি কে, কি আমি? এই প্রশ্নটা আমার সর্বকণ বিজ্ঞাস্ত করত।

আমি হয়ে উঠেছিলাম জীবন-বিমুদ্র; আর তাই একবার আত্মহত্যা করার দৃশ্য প্রচেষ্টাও গ্রহণ করেছিলাম। আমি মানবদের বৃন্দাতে পারি না, যে-জীবন তারা বাপন করে মনে হয় তা একঘেঁয়ে জঘন্য অর্থহীন। সব্বলালিত কোঁচুলের কশেই জীবনের সমস্ত অশ্ব গলি-বৃন্দাচর মধ্যে, সমস্ত রহস্যের মধ্যে উঁকি মেরেছিলাম। এমনও সময় ছিল যখন নিছক কোঁচুলকশেই অপরাধ করতে পারতাম—খুন করলে কেমন লাগে শব্দ এইটুকু জানবার জন্যই খুন করতে পারতাম।

ভয় হয়, আমার প্রকৃত সত্যটি তুলে ধরলে আমার প্রিয়তমার সামনে এমনই এক ছয়ছাড়া ব্যক্তির রূপ প্রকাশ পাবে যার চিন্তাধারা ও অনুভূতি

অন্তরুত — সে এমনই এক শিশু যে তার মনে ভীতি সৃষ্টি করবে, তাকে ঘরে
সাঁরিয়ে দেবে। নিজের ব্যাপারে আমাকে কিছু একটা করতেই হবে। আমি
নিশ্চিত সেই আমার সাহায্য করতে পারে। একমাত্র সেই পারে আমার
মস্তমুগ্ধ করে পারিপার্শ্বিক জীবন সম্পর্কে আমার এই বিকৃত ধারনার
পারিসমাপ্তি ঘটতে। আর তখনই আমার জীবন ও আত্ম অভ্যুত্থান শক্তি ও
আনন্দের বহির্লিখার বিবেচ্যায়িত হবে।

অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সে নিজের কথা বলত, আর অন্যের কাছ থেকে
সবসময়ই হৃদয়ের ব্যবধান রেখে চলত। এ থেকেই আমার ধারণা হয়েছিল
যে সে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারীণী, তার হাতেই রয়েছে জীবনের সকল রহস্যের
চাবিকাঠি আর তাই সে এত প্রাণোচ্ছল, এত আত্ম-বিশ্বাসে ভরপুর।

তার যে সত্তা আমার কাছে কম উন্মোচিত ছিল, সেই টানেই আমি
তাকে ভালবেসেছিলাম। কিন্তু এ কথা ঠিক যে যৌবনের পূর্ণ উন্মাদ ও
কামনা নিয়েই তাকে ভালবেসেছিলাম। যে কামনার আগুনে জ্বলে-পুড়ে
থাক্ হয়ে যাচ্ছিলাম, তা অবশ্যমিত রাখতে আমি স্ততীর মানসিক বশ্তগা
ভোগ করতে থাকি। অপেক্ষাকৃত সহজ, স্থূলভাবে ব্যাপারটা ঘটলে হয়ত সে
বশ্তগার লাঘব ঘটত। কিন্তু নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিহক দৈহিক মিলনের
উদ্দেশ্যে মহৎ কিছু বলেই আমার বিশ্বাস। দৈহিক মিলন বলতে পার্শ্বিক
আচরণই বুদ্ধতাম। বাকিও, আমি শতসমর্থ ও যথেষ্ট অনুভূতিপ্রবণ হৃদয়
এবং আমার কম্পনাশক্তি সহজেই প্রজ্জ্বলিত হত, এই পার্শ্বিক আচরণ আমার
মনে স্থায়ী প্রতিভিন্না সৃষ্টি করত।

কিভাবে যে এই রোমান্টিক স্বপ্ন মশগুল হয়ে গেলাম বলতে পারব না।
কিন্তু আমার জ্ঞানের সীমার বাহুবৃত্তে কোন একটি বস্তুর প্রতিই যেন আমার
ছিল অটল বিশ্বাস।

সেই বস্তুটির মধ্যেই ছিল নারী-পুরুষ সম্পর্কের মহিমাম্বিত ও
রহস্যময় অর্থটি — যা মহৎ, আনন্দময় অথচ ভয়ঙ্কর, যা প্রথম আলোকনের
মধ্যে প্রকাশ পায়। এবং আমার বিশ্বাস এই পরম আনন্দের নির্মল আভিভূতা
যে কোন মানুষকে চিরন্তনে রূপান্তরিত করে দেবে।

আমার ধারণা, পর্দার জ্ঞান থেকে আমার এইসব অস্পষ্ট কল্পনা আসেনি।

বিরুদ্ধকারী হবার জন্যই এসব নিয়ে চর্চা করছি, কারণ আমিই আমার প্রথম পর্বের একটি কবিতার লিখেছিলাম, 'মানব না বলেই এই পৃথিবীতে এসেছি।'

উপরন্তু আমার ছিল অদ্ভুত ও পীড়াযায়ক এক স্মৃতি : এই বাস্তব বহির্ভূত এক জগতে, আমার জীবনের কোন আধিক্য ম'হ'র্তে এক মহান আধ্যাত্মিক উত্তেজনা, এক স্রমধর চাপল্যের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম, যা বলা চলে একতানের পূর্বস্বাধ লাভ করেছিলাম—তা এমনই এক আনন্দ বা প্রথম সুবেদনের চেয়েও উজ্জ্বল। সম্ভবতঃ আমি যখন মায়ের গর্ভে ছিলাম তখন মা যে পরম আনন্দের স্তম্ভ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল তা আমার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। আর তা থেকেই আমার আত্মার জন্ম, জীবনশিখার প্রজ্জ্বলন। আর সম্ভবতঃ মায়ের ভাবাবেশের সেই হৃদবিহ্বল ম'হ'র্তটি থেকেই আমার মধ্যে এই অদ্ভুত ও অস্থির প্রত্যাশা বিরাজ করছে যে নারীর মধ্যে আমি নিশ্চয়ই কিছু অসাধারণের পরিচয় পাবো।

মানুষ যা জানেনা, তা নিয়ে কল্পনা করে। তার জানা অভ্যাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম হল নারীকে ভালবাসা ও তার রূপের পূজা করা।

একদিন নদীতে স্নান করতে গিয়ে একটা বজরার পেছন থেকে কাঁপ দিয়েছিলাম। ফলে বৃকে নোঙ্গরের শেকলের আঘাত লেগেছিল এবং তাতে পা আটকে যাওয়ায় জলের মধ্যে নীচের দিকে মাথা করে আমি ঝুঁলছিলাম। অবশেষে একজন গাড়োয়ান এসে আমায় টেনে তোলে। লোকেরা আমার শরীর নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে দলাই-মলাই করে পেট থেকে জল বার করে। আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি, রক্তবমি করি এবং শয্যাশায়ী হই ও বরফ খেয়ে কাটাতে হয়।

আমার প্রেরণা দেখা করতে আসে। সে আমার বিছানায় বসে জিজ্ঞেস করেছিল কিভাবে ব্যাপারটা ঘটেছিল। কালো অস্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সে তার নরম স্নিগ্ধ হাত কপালে বুলিয়ে দিচ্ছিল।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম সে কি বোকে না আমি তাকে ভালবাসি।

সে সচেতনভাবে হেসে বলল, 'হ্যাঁ, তা ব'লে। কিন্তু ব্যাপারটা ব'লেই খারাপ—অবশ্য আমিও তোমার ভালবাসি।'

তার স্বাক্ষরোক্তিতে পৃথিবী হলো উঠল এবং আলপাশের বাস-বাণিজ্যের গাছ-পালা ধ্বংসিত হুত্বত লালল। আমি ভাববেশ ও কিস্মরে হতবাক হয়ে গেলাম ; তার কোলে মাথা গর্জে ফিলাম। যাবি তাকে শব্দ করে আঁকড়ে না ধরতাম, নিশ্চয়ই আমি সাবানের ধ্বংসের মতো জানলা ফিরে ভেসে বোঁররে যেতাম।

‘নড়াচড়া করো না, খারাপ হবে,’ মাথাটা বালিশে বসিয়ে দিতে দিতে সে কঠিন স্বরে কথাটা বলল। ‘তুমি শান্ত না হলে বাড়ি চলে যাবো কিন্তু। কি পাগল ছেলেরে বাবা! তোমার মতো ছেলে আমি জীবনে দেখিনি। ভালো হয়ে ওঠো, তখন এইসব কথা, এইসব অনুভূতি নিয়ে আলোচনা হবে।’

সে সম্পূর্ণ সংযমের সাথে কথা বলল, তার উজ্জ্বল চোখের হাসি ছিল অবর্ণনীয় কোমল। সামান্য কিছুক্ষণ পরেই সে চলে গেল। আমি আশার উদ্দীপ্ত হলাম এবং বিশ্বাসে বুক ভরে উঠল যে তার সাহায্য পেলে আমি নতুন চিন্তা ও অনুভূতির রাজ্যের সর্বোচ্চ শিখরে উঠতে পারব।

কয়েকদিন পরের কথা। আমরা শহরের বাইরে একটি গিরিখাতের পাশেবেশে একটি মাটির উপরে বসে আছি। নীচে বাতাসের ঝাপটের গাছপালা মাটিতে লুটুটু পড়ছে। দূসর মেঘলা আকাশে বৃষ্টির ইঙ্গিত। নিরস, ভাবাবেগহীন ভাবার সে আমার আমাঘের বয়সের পার্থক্যের কথা বলল। সে বলল আমার পড়াশুনা শুরুর করতে হবে আর এত তাড়াতাড়ি আমার শ্রী ও সন্তানের বোকা নেওরা ঠিক নয়। সন্তানের কাছে মা যে-ভাবার কথা বলে সেই ভাবার কলা এই বেঘনাবাহক সত্যকথাগুলি কেবল তার প্রতি আমার ভালবাসা ও প্রত্যাশে বাড়িয়ে তুলল। তার গলার স্বর ও কোমল কথাগুলো শুনতে যেমন বিবর, তেমনি মিষ্টি। আগে কেউ আমার সাথে এইভাবে কথা বলেনি।

আমি নীচের কিস্তৃত গিরিখাতের দিকে তাকালাম। বাতাসের ঝাপটের ঝোপগুলোকে মনে হচ্ছে কোন ধ্বংসোত্তা সবুজ নথী। আমি অন্তরের অন্তরালে প্রতিজ্ঞা করলাম, সে তার সম্পূর্ণ হৃদয়কে উজাড় করে আমার যে স্নেহ ছেলে দিয়েছে, আমি তার প্রতিজ্ঞান মেব।

‘কোন নিশ্চয় নেবার আগে আমাদের উচিত খুব ভালভাবে চিন্তা-
ভাবনা করা ।’ আমি তার নরম কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম । সে কসে কসে
সবুজ বাগানে ঢাকা শহরের দিকে তাকিয়ে, একটা শত গাছের ডাল দিয়ে
নিজের হাঁটুর উপরে মৃদু আঘাত করতে লাগল ।

‘এবং স্বাভাবিকভাবেই আমাকে বোলেন্সাভের সাথে কথা বলতে হবে ।
ওর সম্বন্ধে শব্দ হারিয়েছে এবং অস্থির হয়ে পড়েছে । কোন নাটকীয়তা
আমার ভালো লাগে না ।’

সমস্ত বিকল্পটাই খুব করুণ ও সুন্দর । কিন্তু ব্যাপারটাতে কিছু হাস্যকর,
বিকৃতিও দেখা দিল ।

আমায় প্যান্টের কোমরটা খুবই জ্বালা । ইতি তিনেক লম্বা একটা
পেতলের কাঁটা দিয়ে কোমরটা ছোট করেছি (এই ধরনের কাঁটা এখন আর
তৈরী হয়না, সৌভাগ্যবশত, কপর্দকশূন্য প্রেমিকদের জন্য) । কাঁটাটা
শরীরে খোঁচা মারছিল ! আর একবার, একটু অসতর্কতার সাথে নড়াচড়া
করায়, কাঁটাটা একপাশে গেঁথে গেল । কোন মতে সেটা টেনে বার করে
ফেললাম । কিন্তু কি ভয়ংকর ! ক্ষত দিয়ে গলগল করে রক্ত বোঁরিয়ে
প্যান্টটা ভিজিয়ে দিল । কোন আন্দরওয়ার পরিনি, বাবাচির জ্যাকেটটাও
বে কোমর অবধি লম্বা । ভেজা প্যান্টটা তো পায়ের সঙ্গে লেপ্টে গেছে, এ
অবস্থায় কিভাবে আমি উঠে বাই ?

এ রকম একটা অশুভ দৃষ্টান্ত, হাস্যকর অবস্থার জড়িয়ে আমি রেগে
উঠলাম । অভিনেতা তার পার্ট ভুলে গেলে যেমন অস্বাভাবিক গলায়
অভিনয় চালিয়ে যায় তেমনি আমি উত্তেজিত গলায় কথা বলতে লাগলাম ।

কিছুক্ষণ সে আমার কথা শুনল, প্রথমে মনোযোগ দিয়ে, তারপরে
স্বাভাবিকভাবেই বিচলিত হয়ে ।

‘কি সব বড় বড় কথা ।’ সে বলল । ‘মনেই হচ্ছে না তুমি কথা বলছ ।’

আমি শেষ কোণাল অবলম্বন করেছিলাম ; আর এখন শামুকের মতো
কঁকড়ে গেলাম ।

‘চল বাড়ি বাই, বৃষ্টি হবে ।’

‘আমি এখানেই থাকব ।’

‘কেন?’

কি উত্তর দেব?

কোমলভাবে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি আমার উপরে রাগ করছ?’

‘না না! নিজের উপর রাগ করছি।’

‘নিজের উপরেও রাগ করা উচিত নয়।’ এই কথা বলে সে উঠে পড়ল।

আমি নড়তে পারলাম না। সেই ঊক কর্মমাত্ত অবস্থায় বসে থেকে কল্পনা করলাম যে রক্তক্ষরণের শব্দ হচ্ছে এবং সে তা শুনতে পেরেছে। আর সে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসছে:

‘ও কিসের শব্দ?’

‘তুমি চলে যাও।’ আমি মনে মনে তাকে মিনতিভরে বললাম।

সে উদারভাবে আরও কয়েকটা কোমল কথা বলল, তারপর ধীরে গিরিপথের ধার ঘেঁসে চলে যেতে লাগল। সে মানোরম ভঙ্গিতে চরণের ছন্দলালিতা দূলে দূলে চলতে লাগল। আমি তার অপসূরমান তন্দ্রাবী দেহের দিকে তাকিয়ে রইলাম—ক্ৰমে সে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। তারপর মাটিতে আছড়ে পড়লাম। আমি নিশ্চিত আমার প্রথম প্রেম অল্পখী হয়ে উঠবে।

আর হ’লও তাই। তার স্বামী অশ্রুপাত করল, বিড়বিড় করে অনেক আবেগভরা প্রলাপ বকল আর সে নিজেও সেই চিটেগুড়ের-স্রোতা সীতের আমার দিকে আসবার জন্য মন স্থির করে উঠতে পারল না।

অশ্রুভরা চোখে সে আমায় বলল, ‘সে বেচারী অসহায় আর তুমি তো শক্তিশালী। ও বলে, আমি তাকে ছেড়ে গেলে সে রোবহীন ফুলের মতো শুকিয়ে বাবে...’

আমি ফুল-উপমের ব্যক্তিটির মোটা-খাটো পা, রুমণীসম্মিশ্র নিতম্ব এবং ধরমুজের মতো পেটের কথা স্মরণ করে হো হো করে হেসে উঠলাম। ওর ব্যক্তিগত মাহি বসে—কারণ সবসময়ই সেখানে খাদ্য থাকে।

সে হাসল।

স্বীকার করল, ‘কথাগুলো শুনলে সীতা হাসি পায়, কিন্তু ও সত্যিই

খুঁজি আঁত পেঁতেছে ।’

‘আমিও পেঁতেছি ।’

‘উঃ ! কিন্তু তুমি যুবক, কমতাবান ।’

জীবনে এই প্রথম অনুভব করলাম আমি যুবকের শব্দ । পরবর্তী কালে প্রায়ই মনেছি যে, এর চেয়েও কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশে যুবকদের দ্বারা পরিবৃত্ত সবলরা কত করুণভাবেই না অসহায় । আর প্রকৃতি যেসব অপ্ৰয়োজনীয় প্রাণীকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায় তাদের বাঁচিয়ে রাখতে শরীর ও মনের কত মূল্যবান শক্তিরই অপচয় হচ্ছে ।

সেই ঘটনার ঠিক পরেই, অল্পই শরীর নিয়ে আমি প্রায় উদ্ভ্রমের মতো শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি এবং প্রায় দু বছর রাশিয়ার পথে পথে ঘুরে বেড়াই । ভঙ্গা ও ডন নদীর উপত্যকাগুলো পার হয়ে বাই ; ইউক্রেন, ত্রিমির ও ককেশাসের মধ্যে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াই, অসংখ্য ঘৃণাপট আঁকছি করি এবং স্বভাবে অনেক বেশী ক্লান্ত ও উদ্ভ্রত হয়ে উঠি । তবুও হৃদয়ের অন্তরালে আমি সেই নারীরই প্রতিমূর্তিটি সর্বদা ধারণ করে রেখেছিলাম—যদিও তার চেয়ে অনেক ভাল, অনেক বৃদ্ধিমতী নারীর সংস্পর্শে আমি এসেছি ।

এবং বছর দুয়েকের কিছু পরে শরৎকালে কোন একদিন তিকলিসে যখন শূন্যলম্ব সে আবার প্যারিস থেকে ফিরে এসেছে এবং আমার এই শহরে থাকার সংবাদে খুশী হয়েছে, জীবনে সেই প্রথম আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম, অথচ তখন আমি মাত্র তেইশ বছরের শব্দ সমর্থ যুবক ।

তার এক বন্ধুর মারফৎ আমন্ত্রণ না জানালে সম্ভবতঃ আমি তার সাথে দেখা করার সাহস পেতাম না ।

তাকে আগের চেয়ে অনেক বেশী মনোহরী, অনেক বেশী আকর্ষণীয় মনে হচ্ছিল । আগের মতোই তার ছিল সেই কিশোরী-প্রতীম দেহ, সুচারু গায়ের রঙ, নীল চোখের কোমল জ্যোতি । স্বামীটি তার ক্রান্তিসেই রয়ে গেছে, সে একা এসেছে তার মেরেকে নিয়ে । মেরেটি হয়েছে হরিণীর মতো প্রাণোচ্ছল ও মাধুরী-মাধানো ।

প্রচণ্ড কষ্ট-বন্দি-বহু মাথার নিয়ে আমি তার সাথে দেখা করতে

গিরেছিলাম ; মৃৎকথার দৃষ্টির দৃশ্য বাতাস ছিল মৃৎকর, বরষা জলধারা সোঁট ডোঁড়িত পাহাড়ের পা বেয়ে এত তীব্রভাবে ছুটে আসছিল যে হাতের ইট-পাথর ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছিল। বাতাসের গর্জন, জলের দৃশ্য কাপটা, ধ্বংস ও ভাঙনের নিনাদে বাড়টা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। জানলার শালিগুলো কনকন করছিল, নীল আলোর কলকানিতে বরষা মৃদুমৃদু উদ্ভাসিত হচ্ছিল, এবং সমস্ত কিছুই যেন অতল গম্বরে তলিয়ে যাচ্ছিল।

ভীত-সন্তুষ্ট শিশুটি বিজ্ঞানার চাবরের মধ্যে মৃৎ লুকিয়েছে ; বিদ্রোহের কলকানিতে চোখে ধাঁধা নিয়ে আমরা জানলার পাশে ঘাঁড়িয়ে আছি, আর কেন জানি না, ফিসফিস করে নীচু গলায় কথা বলছি।

‘এমন প্রচণ্ড ঝড় আগে ঘোঁষনি,’ আমার প্রেরণী বলে উঠল।

হঠাৎ সে আমার প্রশ্ন করে বলে, ‘আমার কথা ভুলে গেছ তো ?’

‘না।’

বিশ্ময়ে, একইভাবে ফিসফিস করে সে বলল, ‘কি স্পার্শ্ব, কি স্পর্শ পাতে গেছ। তুমি সম্পূর্ণ ভিন্ন-মানুষ।’

জানলার পাশে আর্ম্‌চেরারটার সে ধীরে ধীরে বলে পড়ল। অভ্যস্ত উজ্জ্বল এক অগ্নি-সংকেতে চমকে উঠে ছুঁতু কঁচকে বলল :

‘তোমার সম্পর্কে’ অনেক কথা শুনতে পেলাম। এখানে কি করতে আছ ? বল, তোমার খবর কি।’

‘হে ভগবান ! কি ছোট্ট, অথচ কি বিস্ময়কর এই নারী !

আমি মধ্যরাত পর্বত বকবক করে গেলাম, এ যেন তার কাছে আমার স্বীকারোক্তি। প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা চিরকালই আমাকে উত্তেজিত, উদ্ভাবিত উৎসাহী করে। বেরকম একাগ্রচিত্তে সে আমার কথা শুনছিল এবং বেরকম বিস্ময়িত চোখে, অপলক দৃষ্টিতে আমার দেখছিল, মনে হয়েছে আমি নিশ্চরই খুব ভাল কথা বলছি।

‘সত্যিই কি ভয়ংকর !’

বিদ্যায় নিতে গিরে লক্ষ্য করলাম, ‘বিদ্যায়’ কথাটা বলার সময় তার মূখে আর কনিষ্ঠের প্রতি বরোজোস্তের উৎসাহব্যঞ্জক হাসিটি নেই—আগে তার এই স্নেহ হাসি আমাকে সর্বদাই বিভ্রান্ত করে এসেছে। আমি ভেজা-বাতা নিয়ে

হেঁটে চলেছি আর লক্ষ্য করছি ধারালো কাঠের মতো চমিটা কিতানে
 মেঘগুলোকে কেটে টুকরো টুকরো করে বিচ্ছেদ ; আনন্দ ও শূন্যতায় আমার
 মন তখন পরিপূর্ণ । পরের দিন আমি ভাকে তার কাছে এই কবিতাটা
 পাঠিয়ে দিয়েছিলাম (পরবর্তীকালে সে কবিতাটা এতবার আবৃত্তি করেছিল
 যে সেটা আমার মনে গেঁথে গেছে) :

হে আমার মহীরসী নারী ।
 একটি মধুর কথা, একটু স্নিগ্ধ চাটনিতে
 সহজেই তোমার অনুগত হাস হবে এই আনন্দকর—
 বার শিশু-বন্ধতার কদম্ব, তুচ্ছ বস্তু রূপান্তরিত হবে
 ছোট ছোট আনন্দের ঢেউয়ে ।

এই অনুগত হাসটিকে কাছে টেনে নাও ।
 হরত বা এই ছোট ছোট আনন্দের ঢেউগুলোকেই
 সে রূপ দেবে মহা-আনন্দের স্রোতে ।
 এই বিশ্ব কি গড়ে ওঠেনি ছোট ছোট বস্তুকণা দিয়ে ?

আমি তোমার ঘেঁষ এনে হৃদয় ও কদম্ব আনন্দের এক জগত ;
 আর তারও রয়েছে একটি কদম্ব দিক :
 যেমন, একদিকে তোমার এই অনুগত হাস :
 তেমনি একটি সুমধুর দিকও আছে :
 কে আছে তোমার চেয়ে মধুর ?

কিন্তু একটু অপেক্ষা কর ।

শব্দের ভৌতা নখের ডগায়
 তোমার স্বর্গের মাধুরীকে বাবে কি ধরা—
 যে তুমি এই পৃথিবীর
 কীতপরি স্মরণতম ফুলের চেয়েও প্রিয় ?

অবশ্য এটাকে কবিতা আখ্যা দেওয়া যায় না, কিন্তু যথেষ্ট নিষ্ঠার
 সাথেই এটা লেখা হয়েছিল ।

এবং এই আমি, এখন এই পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্যজনক এক ব্যক্তির
 মধুস্বাদু কণ্ঠস্বর—একে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না । সে একটা

নীল রয়ের গাউন পরে আছে । গাউনটা এমন মোলায়েমভাবে তার শরীরে চেঁটে খেলে গেছে যে তার ঘেহের কোন প্রান্ত রেখাকেই আড়াল করেনি । সে তার বেস্তের সূতো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে যেসব কথা বলছে তা আমার কাছে সম্পর্ক নতুন । আমি তার সরু সরু আঙ্গুলের নাড়াচাড়া দেখছি । আঙ্গুলের শেষ প্রান্তে রয়েছে গোলাপী নখ । মনে হচ্ছে আমি যেন একটি বেহালা—কোন এক দৃক ও প্রিয় বাদক তাকে সুরে বাঁধছে । আমি মরতে চাই, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ভেতর ঘিরে এই নারীকে আমার হৃদয়ের মধ্যে পেতে চাই যাতে সে চিরকাল আমারই থাকে । আমার শরীর গভীর হয়ে উঠছে, উদ্ভেজনায় বস্তুগারিস্ট হয়ে পড়ছে এবং মনে হচ্ছে হৃদপিণ্ডটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে ।

আমি আমার প্রথম গল্পটা তাকে পড়ে শোনালাম (গল্পটা সত্য-প্রকাশিত), কিন্তু মনে নেই, গল্পটা সম্পর্কে সে কি মন্তব্য করেছিল । মনে হচ্ছে সে যেন বিস্ময় প্রকাশ করে বলছিল :

‘অর্থাৎ তুমি শেষ পর্যন্ত গভীর লেখকে পরিণত হলে ।’ এবং তারপরই স্বপ্নাবেশের মতো সে বলছিল, ‘এই বৃদ্ধ বছরে তোমাকে নিয়ে আমি কত কিই না ভেবেছি । এটা কি ঠিক যে আমার জন্যই তুমি এইসব কষ্ট স্বীকার করেছ ?’

আমি বিড়বিড় করে যেন বললাম, যে-ভূমণ্ডলে সে বিরাজ করে সেখানে কষ্ট বলে কোন কিছু নেই ।

‘তুমি কি স্বপ্নর... !’

আমার আকুল কামনা হচ্ছে তাকে আলিঙ্গন করার, কিন্তু এমন অস্বভাব দীর্ঘ বাহু ও বিশাল হাত আমার যে তাকে স্পর্শ করার সাহস পেলাম না—আমার ভয় সে হরত আঘাত পাবে । এবং আমি উঠে দাঁড়ালাম, দ্রুত হৃদপিণ্ডের তালে দুলে দুলে ফিসফিস করে বলে ফেললাম :

‘এস, আমার সাথে ঘর বঁধো ; আমি মিনাতি করছি, আমার সাথে ঘর বঁধো ।’

কিঞ্চিৎ বিবলভঙ্গ সে মৃদু হাসল আর তার প্রিয় চোখজোড়া অশ্রুতরকম উজ্জ্বল হয়ে উঠল । ঘরের এক কোণের উঠে গিয়ে বলে উঠল :

‘হ্যাঁ আমরা ভাই করব ; তুমি নিখুঁত নভগোয়ন্ডে বিয়ে যাও ; আমি
কখনোই ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবি ; তারপর চিঠি দিয়ে জানাবো ।’

পূর্বে-পড়া কোন এক উপন্যাসের নায়কের মতো দৃষ্টান্তে মাথা নত
করে আমি যেন বাতাসের উপর বিয়ে হেঁটে চলে এলাম ।

সেই শীতে, সে ও তার কন্যা, নিখুঁত নভগোয়ন্ডে আমার কাছে চলে
এল ।

‘দীর্ঘদিনের বিবাহোত্তর রাতগুলোও ছোট,’ এটা হল একটা রুশী প্রবাসের
কল্পনামর্মকথা । আমার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েও প্রবাসটির সত্যতা বৃদ্ধত
পেরেছিলাম ।

মাসে দু’ রুবেল দিয়ে আমরা একটা পুরো বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলাম—
বাড়িটা একজন রাজকের বাড়ির পশ্চাৎভাগের একটি স্নানাগার । আমি
প্রবেশপথটি দখল করলাম এবং আমার স্ত্রী নিল স্নানঘরটি—এ ঘরটা আমরা
জুইংরুম হিসেবেও ব্যবহার করতাম । বাড়িটা আরো বসবাসের যোগ্য নয়—
আনাচে-কানাচে, কার্ণিসে বরফ জমে । বেশীরভাগ সময়ে আমি রাতেই
কাজ করি । বত জামাকাপড় আছে সব চাপিয়ে তার উপরে একটা কার্পেট
বিছিয়ে দিতাম এবং তৎসঙ্গেও আমার বিচ্ছিন্নরকম বাতে ধরল—ব্যাপারটা
খুবই অপ্রত্যাশিত, বিশেষ করে সেই সময়ে যখন কঠোর পরিপ্রসার জন্য আমি
গর্ব করতাম ।

স্নানঘরটা বেশ উষ্ণ, কিন্তু চুল্লীতে আগুন জ্বালালেই ঘরগুলো সাবান,
সেধ বার্চপাতা ও পচা কাঠের দুর্গন্ধে ভরে উঠত । ফলে ছোট্ট মেয়েটা
(স্নানঘর চোখের পোসিলিনের পুতুল) দাবড়ে বেত ও তার মাথা বাঁধা
করত ।

কসমকালে মাকড়সা ও কাঠ-পিঁপড়ে এই স্নানঘরে এসে বাসা বাঁধত ।
মা আর মেয়ে তো এই সব বেঝামাৎ প্রায় অজ্ঞানই হয়ে পড়ে, আর আমাকে
জুড়োর শূকতলা দিয়ে ওগুলো পিটিয়ে মারতে হয় । জংলা ফুলগাছের
ঝোপ আমাদের ছোট ছোট জানলা ছাড়িয়ে বেড়ে উঠেছে, ফলে ঘরগুলোতে
সবসময়ই আবহা-আলো আবহা-অন্ধকার । কিন্তু মাতাল ও খানখোরালী

বাক্য সেগুলোকে উপড়ে ফেলতে বা ছেঁটে ফেলতে বিত না।

অবশ্যই এর চেয়ে ভাল বাসা পেভার, কিন্তু আমরা সেই বাসার
কাছে কিছু অর্থের ঝগে আবদ্ধ ছিলাম। আর সে আমার এতই পছন্দ
করত যে আমার বেতে বিত না।

সে বলত, 'কিছুদিন থাকলেই অভ্যাস হয়ে যাবে। আর যদি না হয়,
টাকা ফেরৎ দিয়ে বেথানে খুশী কেটে পড়—যদি চাও তো ইংরেজদের কাছে
গিরেও থাকতে পার, তাতে আমার কিছু হার আসে না।'

সে ইংরেজদের খুব ঘৃণা করত এবং বেশ জোর দিয়েই বলত, 'একটা
কুঁড়ের জাত, এক তাস খেলা ছাড়া তারা কখনই কিছু আবিষ্কার করেনি
আর লড়াই করে বলে সে তো জানেই না।'

লোকটা দৈত্যের মতো, লাল গোল মুখ ও বেশ লম্বা লাল ঝাড়ি, আর
এমন মধু খেত যে চার্চ'র কাজকর্ম দেখানুনা করতে পারত না। একটি
খুঁশ, উন্নত-নাশা, কৃষ্ণবর্ণী বর্জি'-মেয়ের প্রেমে খুব হাবুডুদু খেয়েছিল—
মেয়েটি ছিল ঝড়িকাকের মতো।

মেয়েটি তাকে কিভাবে বল করেছে এই কথা বলতে গিয়ে টোকা দিয়ে
ঝাড়ি থেকে চোখের জল ঝেড়ে বলত :

'ও যে একটা স্নাক্‌সী তা জানি। কিন্তু ওকে দেখলে শহীদ কিমিরামার
কথা মনে পড়ে যার, আর তাই আমি ওকে ভালবাসি।'

'সাধু-সন্তদের জীবনী' গুলে সেই বিশেষ শহীদদের খোঁজ করছি, কিন্তু
ভেতন কোন শহীদ নারীর সম্মান পাই নি।

আমি তার কথা বিশ্বাস নাও করতে পারি বুঝে অত্যন্ত হতবুদ্ধ হয়ে ওঠে
এবং আমাকে অভিভূত করার চেষ্টা ক'রে বলে : 'ব্যাপারটা একটু ভালরে
বেথার চেষ্টা কর হে খোকা : বিশ্বাসী আছে লক্ষ লক্ষ আর অবিশ্বাসী
আছে মান্ন করেকজন। কেন বলত ? কারণ চার্চ'বিহীন প্রাণ হচ্ছে জলবিহীন
মাছের মতো। বুঝলে ? এস এ বিষয়ে একটু মধু খাওয়া বাক।'

'আমি মধু খাই না—বলে মধু খাওয়া খারাপ।'

কটী-ভামতে এক টুকরো হোঁজি মাত্র দেখে সে মাথার উপরে কয়েক পাক
ঘোঁরালা এবং শাসনের জুরে বলত :

‘আর তারও কারণ হচ্ছে, তেয়ার বিখ্যাস নেই।’

আমার প্রেরসীকে এই স্নানঘরে থাকতে হয়, রাতে খাবার জন্য মানে কেনার অর্থ নেই বা বাজাটার খেলনা কিনতে পারি না—এই অভিশপ্ত ব্যারিস্টার লজ্জার আমি রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে কাটাই। ব্যারিস্টার জন্য আমার নিজের কোন লজ্জা নেই। কিন্তু এই ভদ্র বংশজাত, মহারিসী ব্যবসী নারীটিকে, এবং বিশেষতঃ তার শিক্ষকন্যাটিকে এই সব সহ্য করতে হয়—খুবই অপমানকর, খুবই হৃদয়বিচলক।

রাতিবেলা ঘরের কোণে আমার লেখার টেবিলে বসে যখন আইনসংক্রান্ত নীতিগত কপি করতাম বা গল্প লিখতাম, হাত কিড়মিড় করতে করতে আমি নিজেকে, আমার প্রেম, ভালবাসা, ভাগ্য ও জনগণকে সামগ্রিকভাবে অভিসম্পাত দিতাম।

আমার প্রেরসী একজন মহারিসী নারী ; সে এমনই এক জননী যে তার সন্তানকে বুকতেই দিত না তার জীবন কত কন্টের। তার মধ্যে কখনও কোন অভিব্যক্তি শূন্যনি ; আমাদের অবস্থা যত কঠোর হয়েছে, তার কঠোর হয়েছে তত প্রাণোচ্ছল, হাসি তত স্বতঃস্ফূর্ত। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সে যাক ও তাঁদের মৃত পত্নীদের ছবি আঁকত এবং জেলার ম্যাপ তৈরী করত। কোন এক প্রদর্শনীতে স্থানীয় প্রশাসক এইসব ম্যাপের জন্য স্বর্ণপদক লাভ করেছিল। ছবি আঁকার অর্ডার না থাকলে, সে সিন্ধু, খড় ও তারের টুকরো দিয়ে আমাদের পাড়ার মেয়েদের জন্য সৌখীন প্যারিসীয় টুপি তৈরী করত। মেয়েদের টুপির ব্যাপারে আমার কোন ধারণা নেই, তবে তার এইসব অশ্রুত সৃষ্টিগুলো নিশ্চয়ই খুব মজার কারণ সেগুলো মাথার দিকে আলনার সামনে ঝাঁড়িয়ে সে উচ্ছ্বাসিত ফেটে পড়ত। আর এইসব টুপি-পরিহিতাদের উপর এর প্রভাবও ছিল খুব অশ্রুত—তারা, যখন এইসব পাখির-বাসা মাথায় চাপিয়ে রাস্তা দিয়ে গট্‌গট্‌ করে হেঁটে যেত বিশেষ এক গর্বে তাদের পেট সামনের দিকে এগিয়ে আসত।

আমি জনৈক উকিলের কেরানীর কাজ করতাম এবং স্থানীয় খবরের কাগজের জন্য গল্প লিখতাম—আমার এই সৃষ্টিশীল প্রচেষ্টার জন্য লাইন প্রতি দুই কোপেক করে দাঁকশা পেতাম। বিরুলে চা-বাগারার আতিথি না

এলে, আমার স্ত্রী তার শুল্কজীবনের গল্প বলে আমার আনন্দ বিত। বোধ-
হয় বেলোস্টকের সেই বোর্ডিং-স্কুলে খিতীয় আলেকজান্ডার প্রায়ই বেড়াত
আসতেন। তিনি যুবতীদের মিষ্টি খাওয়ারতেন এবং তারই ফলে কোন এক
অলৌকিক উপারে তাদের কেউ কেউ গভ'বতী হয়ে পড়ত। আর মাঝে
মাঝেই সেরা স্থল্লরীদের কেউ না কেউ তাঁর সাথে শিকার করতে
বেলোডেস্কায়ার জঙ্গলে যেত এবং সেখান থেকেই সোজা চলে যেত পিটার্স-
বার্গ, বিয়ের জন্য।

সে আমাকে প্যারিস সম্পর্কেও অনেক মজার মজার গল্প বলে ; বইপড়ার
পড়ে ইতিমধ্যে আমিও এইসব বিষয়ে কিছু কিছু জেনে ফেলেছি, বিশেষ করে
ম্যাক্সিম দু ক্যাম্পের লেখা ভারী ভারী বই পড়ে। মন্টমার্টিয়র কাফেগুলো
থেকে এবং লাতিন কোয়ার্টারের উন্মাদ জীবনযাত্রার মধ্যে দিয়ে সে প্যারিসকে
জেনেছে। তার গল্পগুলো মনের চেয়েও উত্তেজক, মনে হত এবং আমি
নারীদের রূপ বন্দনা করে কবিতা লিখি—আমার দৃঢ়বিশ্বাস, পৃথিবীর
যাবতীয় সৌন্দর্য্য তাদের প্রতি ভালবাসার দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছে।

তার নিজের প্রেমের কাহিনী শুনতেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসতাম।
সে এমন সম্মোহনী ভঙ্গীতে ও সারল্যের সাথে সেসব বলত, মাঝে মাঝে
আমিই লজ্জা বোধ করতাম। হাল্কা পেন্সিলের টানের মতো কথা দিয়ে
হাসতে হাসতে সে সেই জেনারেলটির চিত্র তুলে ধরে যার সাথে সে প্রণয়বদ্ধ
ছিল। কোন এক রাজকীর শিকার-বলে জেনারেলটি জারকে প্রথম সুযোগ
না দিয়েই একটি বুনো মোষ গুলি করেছিল, তারপর সেই আহত জন্তুটার
কাছে গিয়ে চিংকার করে বলেছিল : 'হে মহারাজ। ক্ষমা কর।'।

সে আমাকে রাশিয়ার রাজনৈতিক বেশান্তরীদের গল্পও বলে, আর যখনই
সে এ কাহিনীগুলো বলে আমি তার ঠোঁটে প্রসন্নতার মৃদু হাসি দেখতে
পাই। মাঝে মাঝে সে এমন আন্তরিক হয়ে ওঠে যে অত্যন্ত সাধামাটাভাবে
সকলেরই নিম্মা করে ; বিড়ালের মতো জিভের গোলাপী ডগাটাকে ঠোঁটের
উপর বুলিয়ে নেয়, তার চোখে জ্বলে অশ্রুত আলো ; মাঝে মাঝে বিরক্তিও
প্রকাশ করে। কিন্তু বেশীরভাগ সময়েই সে যেন পুতুলখেলার-বস্ত্র একটি
ছোট মেয়ে।

একদিন সে আমার কল :

‘রাশিগানরা প্রেমে পড়লে বড় বেশী বাচাল ও একঘেঁসে হয়ে পড়ে—
কখনও বা বিরক্তিকর বাক্যবাণীশ। কেবল ফরাসীরাই জানে কিতাবে
ভালবাসতে হয়। প্রেম তাদের কাছে প্রায় ধর্মেরই সামিল।’

তারপর থেকেই আমি ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তার সাথে সংবৎ ব্যবহার করি,
তার প্রতি আরও বেশী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করি।

সে ফরাসী মহিলাদের সম্পর্কেও বলত :

‘তাদের মন সবসময়ে আন্তরিকভাবে কোমল নয়, কিন্তু পরিবর্তে তারা
বের সযত্নলালিত যৌনবাসনা। প্রেম তাদের কাছে একটা শিল্প।’

একথা বলার সময় তার কণ্ঠস্বর গভীর ও শিক্ক-মূলভ হয়ে ওঠে।
এইসব জ্ঞান যে আমার খুব বেশী দরকার তা নয়, তবুও তা জ্ঞান, আর
আমিও আগ্রহভরে সেই জ্ঞানসুধা পান করি।

কোন এক জ্যোৎস্নারাতে সে বলেছিল, ‘রুশ ও ফরাসী মেয়ের মধ্যে
তফাৎ হচ্ছে সম্ভবতঃ ফল ও ফলের গন্ধবুত্ত মিষ্টি সন্বেশের মধ্যকার
তফাৎয়ের মতোই।’

সে নিজেও একটি মিষ্টি সন্বেশ। দাম্পত্যজীবনের প্রথম দিকে নারী-
পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে আমার রোমান্টিক ধারণাগুলো আবেগভরে বলে
তাকে খুবই বিস্মিত করেছিলাম।

‘তুমি-কি চিন্তা করে বলছ ? সত্যিই তাই মনে কর ?’ নীল জ্যোৎস্নার
অবগাহন করে, আমার হাতের উপরে ঢলে পড়ে প্রশ্ন করেছিল। তার পান্থর
দেহের মাংস ছিল স্বচ্ছ, আর শরীর থেকে বেরিয়ে আসছিল কাগজী-
বাধ্যমের মিষ্টি গন্ধ। তার সরু সরু আঙ্গুল আমার চুলের মধ্যে আনমনে
ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আর আমার দিকে চম্বল আরত চোখে তাকিয়ে তার ঠোঁটে
খেলাচ্ছিল এক অবিশ্বাসী হাসি।

‘হার ভগবান!’ সে বিস্ময়ে বলে উঠল। মেঝেতে ল্যাফিয়ে সেসে
সামনে-পেছনে, আলো-হারার জাকরিতে পায়চারী করতে লাগল। চাঁদের
আলোর তার শব্দ স্বচ্ছ জলজল করছে, খালি পা মেঝেতে নিঃশব্দে বিচরণ
করছে। কাছে এসে বৃহতে আমার গাল-ধরে মারের সুরে বলল :

‘তোমার প্রথম অভিজ্ঞতা কোন কুমারী মেয়ের সাথে হওয়া উচিত ছিল—
হ্যাঁ ভাই । আমার সাথে নয় ।’

আমি তাকে কোলে তুলে নিলাম, সে কান্ডে লাগল ।

সে নরমভাবে প্রশ্ন করল, ‘তুমি কি বোধ আমি তোমার কেমন ভালবাসি,
বোধ না ? তোমার সাথে যেমন সুখে আছি, কারো কাছে তেমন সুখে ছিলাম
না—সত্যি, বিশ্বাস কর । আগে কখনও এত আপন করে, এত সাকলীল মনে
কাউকেই ভালবাসি নি । তুমি ভাবতেও পার না, তোমার সাথে থাকা কত
স্বপ্নকার । আর তবুও বলছি, আমরা ভাল করেছি—আমি তোমার যোগ্য
নারী নই—তোমার যোগ্য নই । আমি ভাল করেছি ।’

আমি তাকে বুঝতে পারছি না । তার কথার ভর হচ্ছে । তার মেজাজ
ঠান্ডা করার জন্য মৃত্ত বংশীজল সোহাগ ও আদরে তাকে ভরে দিতে
লাগলাম । কয়েকদিন পরে, ভাবাবেগের অশ্রুভরা চোখে সে আবার বলল :

‘আঃ, যদি তুমি আমার প্রথম প্রেমিক হতে !’

মনে আছে সেটা ছিল একটা ঝড়ের রাত ; বুনো ঝোপের ভালগালা
জানলার কাছে আছড়ে পড়ছিল, চিমনি দিয়ে বেগে বাতাস চুর্কছিল, ঘরটা
ছিল অস্বকার, শীতল এবং ছেঁড়া ওয়ালপেপারের শব্দে ভরপুর ।

হাতে কিছু অতিরিক্ত রুবল এলেই আমরা আমাদের বন্ধুদের জমকালো
নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানাতাম ; সেখানে থাকত মাংস, ভদকা ও বীরার,
প্যান্ট্রি এবং নানা ধরনের ভাল ভাল খাবার । আমার প্যারিসীয়টির চমৎকার
খাদ্য-স্পর্শ ছিল, আর ছিল রুশী খাবারের প্রতি আকর্ষণ—সাইচুগ (বাজরা
ও হাসের চর্বিভরা গরুর পাকস্থলী) ; শীত্মাছের পূর-মেওয়া মাংসের
চপ ; আলু-মাংসের স্ন্যপ ।

এক উজনের মতো বন্ধুর সম্ভাষণ-বিশিষ্ট একটি ‘পেট-ক্যাটোনো-ভোজন’
সংস্থা স্থাপন করল সে । এইসব বন্ধুরা আকর্ষণ ভোজন ও পান করতে
পারে । রন্ধন-শিল্প সম্পর্কে এদের জ্ঞান চমৎকার এবং এইসব বিষয়ে তারা
সার্বভৌম ও অস্বাভাবিক দিতে পারে । আমি ভিন্নতর এক শিল্প উপসাহী :
অল খাই এবং খাওয়ারোর ব্যাপারেও অস্বাভাবিক জানব পাই । এই বিষয়টা

আমার নান্দনিক উপাধানসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয় ।

‘শূন্য বস্তু’—পেট-কাটানো-ভোজনকারী তাইবের সম্মুখে আমি একবার মস্তব্য করেছিলাম ।

সে উত্তরে বলেছিল, ‘ভাল করে খাঁকরে দেখবে প্রত্যেকেই শূন্য । হাইনে কোথায় যেন বসেছিলেন, ‘জামা-কাপড়ের নীচে আমরা সকলেই উলর’ ।’

অনেক সমালোচনাসূচক উদ্বেগ জানলেও, আমার ধারণা, সে সবসময় সেগুলো সঠিক প্রয়োগ করতে পারত না ।

সে পুরুষদের ‘ভালরকম নাড়া দিতে’ ভালবাসে আর এই বিষয়ে বন্ধতাও বেশ । যেখানেই যায়, বৃষ্টি ও প্রাণোচ্ছলতার স্পর্শে সবকিছু প্রাণবন্ত করে তোলে এবং যেসব আবেশ সৃষ্টি করে তা কখনই সর্বোচ্চ মানের নয় । তার সাথে কয়েক মূহূর্ত কথা বলার পরই একজন লোকের কান হবে লাল, তারপর গোলাপী, দ্রোণ হবে হলহলে, এবং এক টুকরো বাঁধাকপি দেখলে ছাগল বেভাবে তাকিয়ে থাকে সেইভাবে জুলজুল করে তার দিকে চেয়ে থাকবে ।

‘চুম্বক-নারী’, খাতাভীর সহকারীটি মস্তব্য করেছিল । খিটখিটে ভদ্রলোক, মূর্খভর্তি আঁচল, আর পেটটা যেন চার্চের গম্বুজ ।

ইয়ারোস্লাভ থেকে আগত একটি শূন্য-কেশ ছাত্র তাকে কবিতা লিখে দিত—কবিতাগুলো সবসময়ই ত্রিমাত্রা-ভিত্তিক । ওগুলো আমার খুবই জঘন্য মনে হ’ত অথচ সে হাসতে হাসতে চোখে জল এনে ফেলত ।

‘তুমি অন্যদের প্ররোচিত কর কেন ?’ একবার তাকে প্রশ্ন করেছিলাম ।

সে উত্তরে বলেছিল, ‘এটা মাছ-ধরার মতোই একটা খেলা । একে বলে ছলা-কলা, আর এই পৃথিবীতে আশ্ব-সচেতন এমন নারী একজনও নেই যে এতে আনন্দ পায় না ।’

কখন কখনও সে ধর্তের মতো আমার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করত :

‘হিসেসে হচ্ছে ?’

না, হিসেসে নয়, তবে বিরক্ত বোধ করছি । নোয়ামি আমি সহ্য করতে পারি না । আমি আমরুবে লোক । আমার ধারণা ‘হাসতে পারা’ মানুষ্যের

অন্যতম প্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। আমি সার্কাসের রাউন ও মণ্ডের ভাঁকনের কথা
করি, বাকিও এ কথা ঠিক যে আমি তাদের চেয়ে আঁত সহজেই অনেক ভাল
হাসাতে পারব। প্রায়ই অভ্যাগতদের হাসিরে পেট ব্যথা করে বিতাম।

একদিন সে আমার বলল, 'তুমি চমৎকার কমেডিয়ান হবে। তোমার
মুণ্ডে ওঠা উচিত, সত্যি গো।'

সে নিজের শোখীন নাটকে খুব সুন্দর অভিনয় করেছিল এবং পেলাবার
মুণ্ড থেকে আমন্ত্রণও পেয়েছিল।

'মুণ্ড ভালবাসি, কিন্তু মণ্ডের অন্তরাল সম্পর্কে ভয় করে।' সে বলে।

চিন্তায়, কথায় ও বাসনায় সে সত্যনিষ্ঠ।

সে আমার প্রায়ই বলে, 'তুমি বড় বেশী দার্শনিক। জীবন মূলতঃ নীরস
ও সাধামাটা। সুপ্ত উদ্বেগের অব্যবহা করে একে জঁটিল করার কোন অর্থ
হয় না—আমাদের করণীয় কাজ হচ্ছে তাকে আরও কন্ নীরস করার চেষ্টা
করা। এর বেশী কেউ কিছু করতে পারে না।'

আমার ধারণা, তার দর্শনে বড় বেশী স্ত্রীরোগবিদ্যা ছিল আর 'এ
কোর্স ইন অবসট্রটিক্স', (প্রসূতিবিদ্যা) ছিল তার বাইবেল। সে নিজের
একবার আমার বলেছিল মেয়েদের স্কুল ছেড়ে প্রথম সেই বিজ্ঞানের বই পড়ে
সে কেমন খাতা খেয়েছিল।

'তখন এমন নিষ্পাপ ছিলাম যে মনে হয়েছিল কে যেন মাথার ব্যাট দিয়ে
আঘাত করেছে। যেন মেঘ থেকে লাফিয়ে এসে কাধার পড়েছিলাম, এবং
কিন্ধাস হারানোর ফলে কেঁদেছিলাম। কিন্তু অচিরেই বুঝতে পারলাম
আমার পায়ের ডালার মাটি বেশ শুকনো হয়েছে, বাকিও তা এবড়ো-খেবড়ো।
বারি জন্য সবচেয়ে বেশী কেঁদেছিলাম তিনি হচ্ছেন ভগবান—ওঁকে খুব
আপন করে ভাবতাম এবং হঠাৎ একদিন সিগারেটের ধোঁয়ার মতো তিনি
বাতাসে মিলিয়ে গেলেন, আর তাঁরই সাথে সাথে মিলিয়ে গেল আমার প্রেম
সম্পর্কীয় আনন্দধন স্বপ্নরাজী। স্কুলে আমরা প্রেম সম্বন্ধে কত ভাবতাম,
কত সুন্দর সুন্দর কথাই না বলতাম!'

আমি তার নৈরাজ্যবাবে বিরূপ হইছিলাম। তার মধ্যে ছিল স্কুল
বালিকার সারল্যা ও প্যারিসীয় উচ্চাভিলাষের এক সংমিশ্রণ। মাকে মাকে রক্তের

কলার ডেস্ক থেকে উঠে গুকে দেখতে যেতাম। বিছানার ভাঙে আরও ছোট, আরও স্তম্ভাঙ্গ ও সুন্দর দেখাত। তার দিকে তাকিয়ে ঘাঁড়িয়ে থাকতাম আর জীবনের যে উত্থান-পতন ওর প্রকল্পকে জাঁড়িয়ে রেখেছে তার জন্য ধূম্র বোধ করতাম। তার ধূম্র আমার ভালবাসা আরও নিবিড় হয়ে ওঠে।

সাহিত্যের প্রতি আমাদের স্মৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের : আমি বালজাক ও ক্লাবার্ট-এর ভক্ত। আর ও পছন্দ করত পল ফেভাল, অকটেভ কিউইলেট এবং পল ডি কক। ‘ইয়ান জিরাউড, মাই ওয়াইফ’ উপন্যাসটি তার বিশেষভাবে ভাল লাগত—ওর মতে, যত বই ও পড়েছে তার মধ্যে এটি সবচেয়ে বৃদ্ধিহীণ। আমার মনে হয়েছিল বইটা অপরাধ-আইনের চেয়েও বিরক্তিকর। এসব সম্বন্ধে বেশ ভালই চলছিল আমাদের। একে অপরের প্রতি বিরক্ত হইনি বা ভালবাসার অভাবও বোধ করিনি। কিন্তু আমাদের সম্প্রতি-জীবনের তৃতীয় বছরে বৃদ্ধিতে পারলাম যে আমার ভিতরে কিছু একটা অশুদ্ধ ইঙ্গিত আন্দোলিত হচ্ছে—এবং ক্রমশ তা আরও বেশী তীব্র আকার ধারণ করছে। সেই সময়ে আমি খুব জোর দিয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছি, খুব গুরুত্ব দিয়েই সাহিত্য রচনা শুরুর করে দিয়েছি। অসংখ্য অর্থাধি এসে আমার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। তাদের অধিকাংশ লোকই বিরক্তিকর। আর তাদের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, কারণ আমাদের রোজগার বৃদ্ধির সাথে সাথে ঘন ঘন মধ্যাহ্নভোজ ও নৈশভোজ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

ওর জীবন হয়ে উঠছে একটা প্রদর্শনী, আর যেহেতু সেইসব অর্থাধির সামনে ‘এবার খামদুন’ গোছের কোন বিজ্ঞাপন বুলত না, সে মাঝে মাঝে তাদের খুব কাছে চলে যেত আর তারাও সেটাকে নিজেদের সুবিধা মতো ব্যাখ্যা দিত। ফলে শুরুর হত ভুল বোঝাবুঝি বা আবার আমাদেরই মিটিয়ে ফেলতে হত। কখনও কখনও খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি, এ ব্যাপারে আমি সর্বদাই অক্ষম ; মনে আছে, একবার এক ভুল্ললোকের কান টানার সে অভিযোগ করে বলিছিল :

‘বেশ ভো, খাঁকার করছি দোষ হয়েছে, কিন্তু কোন অধিকারে সে আমার কান ধরে টানবে ? আমি স্কুলের ছেলে নই ! বরসে ওর বিগড়ণ, আর সে কিনা আমার কান ধরতে আসে ! এর চেয়ে মূর্খে খুঁসি মারলেও

কেনী সম্মানজনক হ'ত ।'

আপাততঃ, মেম্বারী সম্মানবোধের সাথে সম্মতি রেখে শান্তি বেতার স্বীকৃতিসহ আমার জেমন জানা ছিল না ।

আমার স্ত্রী আমার গল্পগুলো সম্পর্কে খুব বেশী গুরুত্ব দিত না, কিন্তু প্রথম দিকে ব্যাপারটার জন্য কিছু মনে করিনি । আমি নিজেকে ক্রিয়াশীল করতে না যে কখনও লেখক হবে । একথা সত্যি যে মাঝে মাঝে মনোবৈজ্ঞানিক প্রেরণা বোধ করতাম, কিন্তু মোটের উপর খবরের কাগজের কাজটাকে আমি নিছকই জীবনধারণের একটি উপায় বলে মনে করতাম । একদিন সকালবেলা আমার সারা রাত্রির পরিচর্যার ফসল 'বুড়ি ইজের গিল' গল্পটা তাকে পড়ে শোনালাম । শুনতে শুনতেই সে ঘুমিয়ে পড়ল । প্রথমে রাগ করিনি । পড়া বন্ধ করে, চিন্তামগ্নভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম । আমার এত প্রিয় আদরের মাথাটা শব্দ সোফার পিঠে এলিয়ে পড়ে আছে । ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক এবং শিশুর মতোই শাও কোমলভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে । জানলার উপর বুনো ভোপগুলোর ফাঁক দিয়ে প্রভাতী-সূর্যের আলো এসে তার বুক ও হাঁটুর উপরে সোনালী রং ছাড়িয়ে-ছাড়িয়ে দিয়েছে—বেখে মনে হচ্ছে যেন স্বচ্ছ কুহুমরাজী ।

উঠে বাগানে চলে গেলাম । এখন আমি গভীরভাবে আহত এবং নিজের সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষমতা সম্পর্কেই সন্দেহে ভরপুর ।

আবজানা, লাম্পটা, দারিদ্র ও গোলামী, অথবা অহংকার, বিকৃতি, অস্তিত্বজনের আত্মহীনতায় নির্মজ্জিত নারী ছাড়া জীবনে আমি অন্য কোন নারীর সংস্পর্শে আসি নি । শৈশবে একটিমাত্র মনোরম দৃশ্য দেখতে পেরেছিলাম—সেটা ছিল রাণী মার্গিট-এর, কিন্তু অন্যান্য দৃশ্যের পূর্বতমাল্য আমাকে সেই রাণীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে । আমার ধারণা ছিল, ইজেরগিলের জীবন-কাহিনী নারীদের অনুপ্রাণিত করবে, তাদের মনে স্বাধীনতা ও সৌন্দর্যের কামনা জাগ্রত করবে । আর যে নারীটিকে আমি সর্বোচ্চরে বেশী ভালবাসি—সে ঘুমোচ্ছে ।

কেন ? জীবন আমার হাতে যে অস্ত্র তুলে দিয়েছে তা কি অপব্যক্তি ?

এই নারীটি আমার দ্বারা মায়ের আসনটিও দখল করে নিয়েছিল । আমি

আশা ও বিশ্বাস করেছিলাম যে সে আমার সুজন-কমতাকে আশ্রয় করতে পারবে এবং বাস্তব-জীবনে আমার মধ্যে যে দুঃখতা পড়ে উঠেছে তাকে অনেক মঙ্গল করে দেবে।

সেটা ছিল তিরিশ বছর আগের ঘটনা, সেই স্মৃতি রোমন্থনে আজ আমার ঠোঁটে হাসি খেলে যায়। কিন্তু সেই সময়ে যখন পেন্সে তার নির্বিবাহ স্বামীয়ে পড়ার প্রসঙ্গীত অধিকারে আমি যথেষ্ট দুঃখ পেরেছিলাম।

আমি বিশ্বাস করতাম, বিষয়তা হ্রস্ব করতে হলে হালকা সূত্রে কথা বলতে হয়। আমার আরও সন্দেহ ছিল, যে-ব্যক্তি মানুষের দুঃখ-কষ্ট উপভোগ করে, সে মানুষের অন্যান্য বিষয়েও হস্তক্ষেপ করে। সে হচ্ছে শরতানের আত্মা, সে আজগুবি পারিবারিক করুণ নাটকীয়তা সৃষ্টি করে এবং মানুষের জীবন ধ্বংস করে। এই অদৃশ্য দানবটিকে আমার ব্যক্তিগত শত্রু মনে করে তার ফাঁদ থেকে বাঁচবার জন্য আমি বখাসাধ্য চেষ্টা করতাম।

মনে আছে, ‘সকল অস্তিত্বই বস্তুগারিস্ট’, এই প্রবাবটী পড়ে (ওয়েল-বার্গের ‘দুঃখ, তার শিক্ষা ও শিবা’ গ্রন্থে) আমি ভীষণ বিরক্ত হয়েছিলাম। জীবনে যদু বেশী আনন্দ দেখিনি, কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, জীবনে দুঃখ-কষ্ট একটি আকস্মিক ঘটনা, অবশ্যম্ভাবী নয়। এবং বিশপ ক্রিসানথাসের ‘ব্রহ্মস্বেদের ধর্ম’ গ্রন্থটি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পড়ে আরও গভীরভাবে নিশ্চিত হয়েছিলাম যে, যে-শিক্ষা দুঃখ, ভয় ও বস্তুগাকে জীবনের অসৌখ্য সঙ্গী করে তোলে সেই শিক্ষার চেয়ে আমার প্রকৃতির বড় শত্রু আর কিছু হতে পারে না। ধর্মীয় ভাবাবেগের মধ্যে বেশ কিছুকাল অবস্থান করে আমি এর অপমানকর নিষ্ফলতা সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। বস্তুগ-ভোগ আমার কাছে এত দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল যে, যেকোন ধরনের নাটকীয়তাকেই ঘৃণা করতাম এবং করুণ নাটকীয়তাকে দৃষ্টান্তের সাথে মিলনাস্তক করতে শিখেছিলাম।

আমার বাড়িতেই যে একটি পারিবারিক নাটকীয়তা সৃষ্টি হতে থাকে, এবং আমরা উভয়েই যে তা রোধ করার আশ্রয় চেষ্টা করছি, শুধুমাত্র এইটুকু বলার জন্য এসব কথার মধ্যে শব্দভাষ্য কোন মনে হয় না।

আমার প্রকৃত সত্যকে খঁজে বার করার জন্য যে জটিল পথ করে আমি য়ুরে বোরেরাই, সেই পথেরই পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে এইসব দার্শনিক পৌত্তল্যিকতা ।

সহজাত প্রাণোচ্ছলতার জন্যই আমার স্ত্রীর পক্ষে এই নাটকে অভিনয় করা সম্ভব ছিল না—বহু ‘মনস্তাত্ত্বিক’ রুশী নারী ও পুরুষ ঘরে ঘরে এই খেলাকে ভীষণভাবে উপভোগ করে ।

আর এতদসঙ্গেও সেই শূন্য-কেন্দ্র ছাত্রটির বিকল্প চিত্রাঙ্গিক কবিতাগুলো তার উপরে শরতের বৃষ্টির মতোই প্রভাব ফেলেছিল । সুস্থর গোল গোল অক্ষরে সে তার নোট-খাতার পাতার পর পাতা ভরিয়ে ফেলত ! এবং সেগুলোকে বইয়ের ভিতরে, টুপি মতো, এমন কি চিনির পায়ে পৰ্ব্বত গর্ভে দিত । কোন নির্দত্ত-ভাজের কাগজ চোখে পড়লেই আমি তা স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে বলতাম :

‘তোমার মন-গলানোর এই সাম্প্রতিকতম প্রচেষ্টাটি গ্রহণ কর !’

প্রথম প্রথম কামমেঘের এই কাগজের তীরগুলো তার উপরে কোন ছাপ ফেলত না ; সে আমার কবিতাগুলো পড়ে শোনাত এবং এইসব লাইন শূন্যে আমরা একই সাথে হেসে উঠতাম :

শূন্য তোমারই জন্য চিরকাল করি বাস
আর সব সুখ খুশী মনে করি ত্যাগ,
তোমার যেহের উকতা পাবো বলে,
প্রতীক্ষা করি, নিম্নীলেশ চোখে দেখি,
(তোমার) চলার ছন্দ, গ্রীবার প্রতিটি বাক,
(মোর) শোন-চোখ ঘোরে কোমল শয্যা পরে...

কিন্তু সেই ছাত্রটির কাছ থেকে এরকম আর একটি স্বীকারোক্তি পাবার পর সে একদিন চিন্তিতভাবে বলল :

‘ওর জন্য বৃথা লাগছে ।’

কথাটা শূন্যে আমি বললাম যে আমিও বৃথা বোধ করছি, তবে ওর জন্য নয় । তারপর থেকে সে আমার সামনে তার কবিতা পড়া বন্ধ করে

দিয়েছিল।

কাঁবাটি শ্বাসস্থান, বুক—আমার চেয়ে চার বছরের বড়। শ্বশপতনী, একপেঁরে এবং পানাস্ত। রবিবারের বিনগল্লোতে সে বৃন্দ্র বৃট্টের সময় খেতে আসে এবং রাত বৃট্টে অবধি চুপচাপ, স্থিরভাবে এখানে থেকে যায়। সে আমারই মতো জনৈক উঁকিলের কেরাণী। এমনই আনমনা যে তার ভালমানুষ মনিবাটি পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে দেখছিলেন। উপরন্তু সে তার কাজ-কর্মের ব্যাপারেও খুব নির্বিকার এবং প্রায়ই মোটা গলার মন্তব্য করে বলত : 'বতসব আজবাজে কাজ।'

'কোনগুলো আজবাজে কাজ নয়?'

'হুম...কথাটা কিভাবে বোঝাব?'

পান্দুর নিন্তেজ চোখজোড়া ছাঘের দিকে তুলে চিত্তান্বিতভাবে উত্তর দিত। কখনই বৃকে উঠতে পারত না কথাটা কিভাবে বোঝাবে। তার একঘেঁরোমিতে আমি মার-পর-নাই বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। মদ খেত প্রচুর, কিন্তু নেশা হত খুব ধীরে ধীরে, আর যখন নেশা হত যারবার নাক দিয়ে একটি বিচ্ছারি শব্দ করত। এইসব বিকৃত বৈশিষ্ট্য ছাড়া তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আর কিছুই দেখতে পাইনি, কারণ একটা নিরমই আছে, কোন স্ত্রীর প্রতি তৃতীয় ব্যক্তি প্রেম নিবেদন করলে তার মধ্যে স্বামী কেবল খারাপ জিনিসগুলোই দেখতে পার।

ইউক্রেন থেকে কবির এক ধনী আত্মীয় তাকে মাসে পঞ্চাশ রুবল করে পাঠাত—সেই আমলে এই অর্থের মূল্য অনেক। রবিবার ও অন্যান্য ছুটির বিনগল্লোতে সে আমার স্ত্রীর জন্য চকলেট কিনে আনত এবং তার জন্মদিনে তাকে একটি গ্যালাম্ব ঘড়ি উপহার দেয়—ঘড়িটার যে মর্তিটা আছে সেটা হল, একটা দশের উপরে একটি পেঁচা সাপ মারছে। সেই বাজে বস্তুটা আমাকে কেবলই এক ঘণ্টা সাত মিনিট আগে তুলে দিত।

আমার স্ত্রী ছাত্রটির সাথে হলাকলা কথ করে দেয়। সে কাঁবাটিকে নারীসুলভ কমনীয়তা দিয়ে দেখতে থাকে—কারণ সে মনে করে সে-ই তার মানসিক আবেগজনিত ভারসাম্য নষ্ট করার জন্য দারী। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, কিভাবে এই দুঃখজনক ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটবে বলে মনে হয়।

সে বলে, 'জানি না।' তার প্রতি আমার নির্বিশেষ কোন অনুভূতি নেই, কিন্তু তাকে নড়া দিতে চাই। তার মধ্যে কিছু একটা বৃহৎ অবহার আছে— আমি হয়ত তা জাগিয়ে তুলতে পারব।'

সে নিঃসন্দেহে সত্যি কথা বলছে। সে সর্বদাই কাউকে না কাউকে জাগিয়ে তুলতে চেরেছিল এবং প্রশংসনীয়ভাবে তাতে সফল হয়েছিল। কিন্তু সে সাধারণতঃ পুরুষের মনে পশুতাবই জাগিয়ে তুলত। আমি তাকে সাসরি গম্ব শোমাই, কিন্তু তাতে কোন কাজ হয় না এবং দেখতে পাই, ধীরে ধীরে আমাকে বাড়ি, ছাগল ও শুরোরেরা ঘিরে ধরছে।

পরিচিত লোকেরা তার সম্বন্ধে রোমহর্ষক গম্ব বলতে শুরু করেছে, কিন্তু আমি কখনো রুঢ় ভাষায় তাদের প্রত্যুত্তর দিইনি :

'এ ধরনের কথা বললে তোমার তুলে আছাড় মারব।' আমি বলতাম।

তাদের কেউ কেউ অপমানে সরে পড়ে, কেউবা ক্লেষ হয়ে।

'রুঢ় ব্যবহার দিবে কোনদিনই কিছু লাভ করতে পারবে না। লোকেরা আরও বাজে গম্বই ছড়াবে। তুমি নিশ্চয়ই ঈর্ষান্বিত নও, তাই কি?' আমার স্ত্রী আমার বলেছিল।

না, আমি খুবই তরুণ ও আত্ম-বিশ্বাসী, তাই ঈর্ষান্বিত। কিন্তু এমন কিছু চিন্তা, অনুভূতি ও সমস্যা আছে যা মানুষ তার প্রেমাস্পদ নারী ছাড়া আর কাউকেও বলতে পারে না। মধুর আলাপনের মূহুর্ত-গুলোতে সে নিজের হৃদয়কে সেই নারীর কাছেই সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দেয় যে তারই ঈশ্বরে বিশ্বাসিনী। আর যখন ভাবলাম যে কোন এক ঘনিষ্ঠ মূহুর্তে অন্য কারো কাছে সে আমার এই একান্ত নিজস্ব বিষয়গুলো প্রকাশ করে দিতে পারে, আমি বেপরোয়া হয়ে উঠলাম; বুঝতে পারলাম এ হচ্ছে বিশ্বাস-ঘাতকতা। সম্ভবতঃ সকল ঈর্ষার ভিত্তি হিসাবে এই সম্বন্ধই কাজ করছে।

বুঝতে পারলাম, যে-জীবন আমি ঘাপন করছি তা কাল্পনিক পথ থেকে আমার সন্নিকটে দিতে পারে। ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরে গেছি, সাহিত্য-সেবাই হবে আমার সার্বিক সাধনা। কিন্তু এ রকম পরিস্থিতিতে সে সাধনা অসম্ভব।

জীবন থেকে আমি এই শিক্ষা পেয়েছি যে, মোহ-মুগ্ধতা নিয়েই মানুষকে

গ্রহণ করতে হবে—তাদের প্রতি সম্মান বা আত্ম হারানো চলবে না। এই শিকার বলেই আমি হিলাম খুশী, কোন পারিবারিক নষ্টক সৃষ্টি করা থেকে বিরত। আমি দেখেছি সকল মানুষই চিরকন-সত্য নামক অচেনা ভাববোধের কাছে অশ-বিস্তর অপরাধী, এবং প্রতিটি ব্যক্তিই নিজের ন্যায়-বোধের কাছে বতখানি অপরাধী, মানুষের কাছে ততখানি নয়। আত্ম-ন্যায়-বোধ হচ্ছে ভরংকর অসম্ভাবিকতা। যা পাপ-পদ্য-বোধের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে। আর এই পাপ-পদ্য-বোধ গড়ে উঠেছে আইনসভ্যত বিবাহের মধ্যে দিয়ে—হিংসা ও ধর্মের মধ্যে দিয়ে নয়—বার পুরোহিত হিসেবে কাজ করে সেই আপাত-নিষিদ্ধ প্রয়োজন। বিবাহ এমনই একটি রহস্য, বার মধ্য দিয়ে দুটো বিপরীত চরিত্র মিলিত হয়ে প্রায় সব সময়ই একটি নীরস মাঝামাঝি অবস্থার সৃষ্টি হয়। শিশু যেমন বরফ ভালবাসে, তেমন আমিও সেই সময়ে রহস্যময়তা ভালবাসতাম। রহস্যময়তার উজ্জ্বলতা আমাকে দামী মনের মতোই উজ্জ্বলিত করত। আর কথার রহস্যময়তাকে ব্যবহার করা হয় বাস্তব ঘটনার ত্রু ও বৈকল্যকে রহস্যময়তাকে লাক্ষ্য করার জন্য।

‘আমার মনে হয়, আমার চলে যাওয়াই ভাল,’ শ্রীকে বললাম।

উত্তর দেবার আগে সে একটু ভাবল।

‘হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। এ জীবন তোমার ভাল লাগছে না, আমি বুঝতে পারছি।’

দুজনেই কিছুক্ষণ বিষর ও নীরব হয়ে রইলাম। তারপর আমরা আলতোভাবে আলিঙ্গন করলাম এবং আমি শহর ছেড়ে চলে গেলাম। তার কিছু পরে সেও চলে গেল এবং অভিনয়ে যোগ দিল।

আর এই হচ্ছে আমার প্রথম প্রেমের কাহিনীর পরিসমাপ্তি—একটি করুণ পরিসমাপ্তি ঘটলেও, কাহিনীটি আনন্দদায়ক।

কিছুদিন হ’ল সে মারা গেছে।*

* স্যাক ভুল করেছিলেন : ১৯২৮ সালের ১৪ই এপ্রিল, ক্যামিন্সকারার কন্যা ও ইন্ডিনা-সোশ্যালকোডকে লিখিত একটি পত্রে তিনি তাঁর ভুলের কথা বলেন : ‘১৯২৮ সালে ভারতীয়রা একটি চিঠিতে জেনেছিলেন ওলগা নিমোনিয়ার মারা গেছে।

‘আজ একটা চিঠি থেকে জানলাম যে তোমরা দুজনেই ভাল আছ, তবে তোমাদের আর্থিক সংকট চলছে। যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে এবং আমার সাহায্যের কথায় তুমি বা ও. ওয়াই রাস না কর, তবে আমি তোমাদের বখাসখা সাহায্য করতে ইচ্ছুক।’

তার পক্ষের উল্লেখযোগ্য বিকল্প ছিল, সে ছিল প্রকৃতই একজন নারী। সে জানতো প্রাত্যহিক জীবনকে কিতরনে নিতে হবে, অথচ তার কাছে প্রতিটি দিনই ছিল হুটির দিনের প্রাকাল। সব সময়ই তার প্রত্যাশা ছিল, আগামীকাল পৃথিবীতে নতুন নতুন, মনোহর ক'ল ক'টবে, চমককার মনোবহন দেখা দেবে এবং অস্বস্ত সব ঘটনা ঘটবে।

জীবনের কষ্টকে সে উপহাস ও অবজ্ঞা করত, মশার মতো বিভাঙ্কিত করত। যে কোন ভাল জিনিসেই প্রাণোচ্ছল কিম্বদ প্রকাশ করার জন্য সে প্রস্তুত হয়ে থাকত। সেটা স্কুলের মেয়ের অকৃত্রিম প্রাণোচ্ছল নয় ; সেটা ছিল এমনই একজন ব্যক্তির প্রাণবন্ত আনন্দ যে জীবনের বর্ণবহুল পরিবর্তন-সমূহ, মানব-সম্পর্কের অল্প-মধুর জটিলতা, সুখ-রাশির-মধ্যে-ছিটকে-পড়া মূলোকণার মতো প্রাত্যহিক ঘটনাপ্রবাহকে ভালবাসে।

সে-যে মানুষকে ভালবাসত, এ কথা আমি বলতে পারি না, কিন্তু তারের পর্ববৈকল্য করতে ভালবাসত। প্রায়ই সে স্বামী-স্ত্রী ব্যা প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে জমে-ওঠা নাটকে স্বরাস্বিত অথবা মশ্বীভূত করে চলত। এর জন্য কারও মনে জাগিয়ে তুলত ঈর্ষা আবার কারোও মনে বাড়িয়ে তুলত মোহাবেশ। এই বিপজ্জনক খেলায় সে বেশ মেতে উঠেছিল।

সে বলত, 'ক'ধা ও ভালবাসা পৃথিবী নিরস্ত্রণ করে আর বর্শন তা ধ্বংস করে। ভালবাসার জন্যই মানুষ বেঁচে থাকে—এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'।

আমাদের পরিচিতদের মধ্যে ছিল একজন ব্যাংকের কেরানী। লোকটা রোগা ও চ্যাত্তা—বকের মতো ধীর, অহংকারী লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটে। পোষাক নিয়ে তার ছিল ঋতুভেদে বাই। আরনার সামনে বাড়িয়ে হাড়-জির-জিরে আঙ্গুল দিয়ে কোটের মরলা ঝাড়ত। অবশ্য সে মরলা সে হাড় আর কেউ দেখতেই পেত না। যেকোন মৌলিক ভাবনা-চিন্তা বা ভাবব্যঞ্জক কথায় সে ছিল শত্রু ; তার জড়-জিহ্বার ওসবের বাংলাই ছিল না। ধীরে ধীরে গুঁহিরে কথা বলত। আর তার শ্রির সত্য কথাগুলো বলার সময় সে অবশ্যই নিস্ত্রাণ আরঙ্গুলগুলো দিয়ে পাডলা, লাল পোক জোড়া টেনে টেনে সোঁদা করত।

‘কর্তামানকে শিল্পের উপযোগী করার প্রচেষ্টায় কলকমে রসায়ন বিজ্ঞান
কমশই বেশী বেশী গুরুত্ব লাভ করবে। এ কথা ঠিক যে নারীরা
খামখেয়ালি। শ্রী ও শ্রমের মধ্যে পার্থক্য কোন পার্থক্য নেই—
পার্থক্য রয়েছে কেবল আইনগত।’

একবার আমার শ্রীকে বেশ ভাবগভীরভাবে বলছিলাম : ‘তুমি কি
এখনও মনে কর যে সব সরকারী কর্মচারীরাই ডালা আছে?’

সে গভীর ও অপরাধীর মতো বলছিল :

‘ওহ না, তা নয়, কিন্তু আমার মতে হাতিকে অংশ-সেখ ডিম খাওয়ানো
অবাস্য।’

মিনিট দুয়েক আমাদের এইভাবে কথা বলতে শব্দে বন্ধুটি বেশ
গভীরভাবে মত্তব্য করছিল :

‘আমার মনে হয় তোমরা গুরুত্ব দিয়ে কথা বলছ না।’

আর একবার হাঁটুতে টোঁকলের পারায় বেশ আত্মহীন আঘাত খেয়ে সে
প্রত্যয়ের সাথে বলছিল :

‘মনে কতুর একটি প্রগাথীত গুণ।’

কোন এক সন্ধ্যায় তাকে বরজায় দেখেই আমার শ্রী আমার হাঁটুর উপরে
কর্কে গড়ে ধুশীতে গদগদ হয়ে বলে উঠল :

‘কি নিরেট আন্ত হাঁদারাম লোকটা! আন্ত হাঁদারাম—চলার...বলার...
সব কিছুতে! অসুস্থ চালচলনের জন্যই ওকে আমার ভাল লাগে। গালে
একটু হাত বুলিয়ে দাও।’

তার মিন্টি চোখের নীচু যে অংশটুকু বলিরেখা দেখা দাঁড়ান, সে চাইত
আমি সেখানে আলতো করে আঙ্গুলের ডগা বুলিয়ে দিই! বেড়ালহানার
মতো আমার গা ঘেঁষে বসে সে আদরে গলায় বলত :

‘লোকজন কি চমৎকার রকম আকর্ষণীয়, অন্যের কাছে যে লোকটা
পুরুষদের বিরক্তিকর সেও আমার কোঁতুল লাগতে পারে। বাজের
ভেতর যেভাবে উঁকি দারি সেভাবেই তার দিকে তাকাতে পারি—হরত
এমন শ্রোণন কিছু পেয়ে বাই বা অন্যেরা কখনও আকর্ষণ করতে পারে
নি, আমিই প্রথম তা দেখি।’

তার 'আবিস্কারের' অনুসন্ধানে কোন কৃতিত্বতা ছিল না ; কোন অশ্রুত করে কোন শিশু প্রথম হুকে যেমন খুশী ও অনুসন্ধানের হয়ে উঠে, তেমন-তাই সে অনুসন্ধান করত । কখনও কখনও কারো অবাধ চোখে চিত্তার বর্ণিত আনন্দের সাক্ষ্য হলেও সে বেশীরভাগ সময়ে তাকে পাবার কামনাই জাগ্রত করত ।

সে নিজের বেহের প্রশংসা করত, আরনার সামনে উল্লস হয়ে ঘাড়িয়ে বিশ্বাসে বলত :

'কি সুন্দর করেই না নারীকে তৈরী । শরীরের প্রতিটি রেখা কি হৃদ্যবান !'

এবং আবার বলত :

'ভাল পোষাক পরলেই নিজেকে বেশী শান্তিলালী, স্বাধীন্যবতী ও বুদ্ধিমতী মনে হয় আমার ।'

কথাটা সত্যি : একটা সুন্দর ব্রক পরলেই তার বুদ্ধি ও প্রযুক্ততা বেড়ে যেত, চোখে খেলত বিজয়ীনার ঠমক । সাধারণ ক্যালিকো কাপড় থেকে সুন্দর সুন্দর ব্রক বানাবার দক্ষতা ছিল তার । খুবই সাধামাটা পোষাক, অথচ তা রাজকীর ঠটি এনে দিত । অন্যান্য মহিলারা গুলো দেখে হাসিতে ফেটে পড়ত—তবে সবসময়ই গুরুত্ব দিয়ে নয়, কিন্তু উচ্চস্বরেই হাসত । তারা হিংসা করত তাকে এবং আমার মনে আছে তাদের একজন বেশ রুদ্ধভাবে বলেছিল :

'আমার গাউনটা তোমার চেয়ে তিনগুণ দামী অথচ বেশ ভাগের এক ভাগও সুন্দর নয় । তোমাকে দেখলেই চোখ জড়িয়ে যায় ।'

মহিলারা যে তাকে অপছন্দ করবে ও তার সম্বন্ধে গুরুত্ব হুড়াবে এতো স্বাভাবিক । একজন মহিলা ডাক্তার, যেমন রূপসী তেমনই বোকা, আমাকে একবার বলেছিল :

'ঐ মেরেলোকটা তোমার রক্ত চুষে শেষ করে দেবে ।'

প্রথম প্রেম থেকে আমি অনেক বিদ্বেষ দিকা লাভ করেছি, তবুও আমারই দ্বারা যে বহুভিত্তিক কার্যকর দেখা দিয়েছিল, তা আমাকে বশ্চর্য্য করে ।

আমি জীবনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেছিলাম, দেখতাম অনেক, চিন্তা করতাম আরও বেশী এবং সবার চক্ৰান্তার মধ্যে বেঁচেছিলাম। একরাস ককেশ কণ্ঠস্বর সর্বদা আমার দিকে এই প্রশ্ন ছুঁড়ে কিত যে সে অপদার্থ।

বাজারে একদিন দেখেছিলাম একটা পুঁলিশ একজন স্তম্ভর একচোখা বড়ো ইহুদিকে ধরে পেটোচ্ছে। বড়োটার অপরাধ, সে একটা কেরিওয়ালার মূলো চুরি করেছে। আমি বৃন্দটিকে দেখেছিলাম, জামাকাপড় খুলেয়ে ভরা, ধীরে আত্মসম্মানের সাথে হেঁটে চলেছে যেন পরে-সাঁকা ছবি, তার আরও চোখটি তপ্ত মেঘহীন আকাশের দিকে তোলা, মুখের কোণ থেকে রক্তের সন্ধ্যা দ্বারা নেমেছে তার লম্বা সাধা দাড়িতে।

সেই থেকে তিরিশটি বছর পার হয়ে গেছে, অথচ আজও তার সাধা ভূরুর কপন ও আকাশ-পানে-তোলা চোখের নীরব প্রতিধাব দেখতে পাই। মানুষের প্রতি অবমাননা ভোলা খুবই কঠিন—আর কখনও যেন তা ভোলা না হয় !

আমি হতাশ মনে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম, ক্রোধ ও হতাশায় হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল। সেই অভিজ্ঞতা আমার মনে এই পৃথিবীর প্রতি ঘৃণা জাগ্রত করেছিল। মনে হয়েছিল যে আমি এই পৃথিবীতে একজন বহিরাগত, এখানকার যা কিছু নীচ, ঘৃণ্য, অর্থহীন ও ভয়ঙ্কর, মানবাত্মার কাছে যা কিছু অপমানকর সেসব আমাকে দেখিয়ে আমার উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। ঠিক সেই সময়েই আমার ও আমার প্রেমসীর মধ্যকার বিরাত ফারাক সম্পর্কে আমি সবচেয়ে বেশী সচেতন হয়ে উঠি।

আমার মনের কথা তাকে বলতেই সে ভীষণ বিস্মিত হয়েছিল।

‘এই জন্য তোমার মনের এই অবস্থা ? তোমার স্মার দেখছি খুবই দুর্বল !’ তারপরই বলল, ‘কি বললে ? লোকটা স্তম্ভর ? যার একটা চোখ নেই সে কিভাবে স্তম্ভর হবে ?’

যেকোন বস্তুগাই তার কাছে অসহনীয় ; কোন লোক দুর্ভাগ্য নিয়ে আলোচনা করলে সে সহ্য করতে পারত না, ছন্দোবদ্ধ কবিতার সে মৃদু হ’ত না ; এবং কথোচনে সে গভীর মানবিক সহানুভূতি প্রকাশ করত। তার প্রিয় কবিদের একজন হলেন হাইনে, যিনি নিজেই বস্তুগাকে উপহাস করতেন, এবং বিতীর্ণজন বেরাঙ্গার।

জাহ্নবীর প্রতি শিশুর যেমন মনোভাব, জীবনের প্রতি তারও মনোভাব ছিল সেইরকম অর্থাৎ জাহ্নবীর সকল খেলাই মজার, কিন্তু সবচেয়ে মজার খেলাটা এখনও তোলায় আছে। খেলাটা সে হরত কাল বা পরশু নাও দেখাতে পারে, কিন্তু একদিন না একদিন দেখাবেই।

আমি কিস্তি করি মৃত্যুর মৃদুভেঁও সে সেই শেব, সবচেয়ে কিস্তিরকর এবং উল্লেখযোগ্য খেলাটা দেখবার আশা করেছিল।

যুঁজি-সঙ্গীত

অসমীয়া নন্দন। হঠাৎ থেকে মনে হ'ল আলস্যে গা এলিয়ে নিশ্চিন্ত
তন্দ্রানুবে উপভোগ করছে। নীল চাঁদের আলোর তার সবাই নিভ। রাজকীর
মাদুরী নিয়ে সমুদ্রটো ঘীর্ণন বিপ্লবে আকাশের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে।
জলের নীচে ভাসছে পেন্‌কো জুলোর মত জ্বাটবীণা মেঘ। তাকে ধরে
ইতস্ততঃ হাঁড়ি-হাঁড়ি আছে মণিমাণিক্যের মত উজ্জ্বল নক্ষত্রের ভিড়।
ছোট ছোট ডেউগাগুলো পরস্পরের সঙ্গে কিসকিসিয়ে কী সব আলাপ করছে।
সমস্ত আকাশটা বেন করুক, আড়ি পেতে তা শোনবার জন্য সচেতন।

এদিকের পর্বতগুলোর আপাদ-শীর্ষ জ্বলে ঢাকা। তাদের মাথার
দেশে আছে অশ্বকারের কোমল মধুর স্পর্শ

ধ্যানমগ্ন পর্বতশৃঙ্গের কালো ছায়া ঘিরে সমুদ্রের সন্দেশ, সমুদ্র ডেউগাগুলোর
শরীরে সবাই মোড়া। বেন তারা জলে-জলে ভাসনের শব্দকে, সমুদ্রের
শীর্ষ-স্বাসকে একেবারে স্তম্ভ করে দিতে চায়। স্বাভাবিক! চাঁদ যে এখনও
পাহাড়ের দেয়াল ভিড়িয়ে বেরিয়ে আসতে পারে নি।

‘আম্মা হো আকবর!’ নাদির রাজিম গুণিল মৃদু স্বরে ধানি তুলল।
নাদিরের বয়স হয়েছে। ক্রিমিরায় সে একটা আত্মবল বেধা-শোনা করে।
লম্বা, মাথায় ধবধবে সাধা চুল, গায়ের চামড়া রীতিমত রোমে লেঁকা।
পাতলা গড়নের একজন জ্ঞানী বৃদ্ধ এই নাদির।

একটা উঁচু পাথরের চহি-এর পাশে বালির উপর আমরা হুঁজুন শূরে
হিলাম। কালো ছায়া অনেকটা শীর্ষ হয়ে পাথরের ওপর পড়েছে। বিধ্বস্ত
বিবর্ণ এই পাথরটি হরত কোন এক কালে পাহাড় থেকে খসে এখানে
পড়েছিল। পাথরটির গা জুড়ে ছোপ ছোপ শ্যাওলা। শরীরের একাংশ
বহুদিন ধরে গজিয়ে ওঠা কিছু সামুদ্রিক লতা বেন পাথরটিকে বালির সঙ্গে
আর্দ্রপটে বেঁধে রাখতে চাইছে। আমাদের তাঁবুর আগুনের বিদ্যার
সমুদ্রতট উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মাটিতে কিলকিল করছে তাদের লকলকে
ছায়া। বেন ভাসনের রেখাচিত ঘিরে মাটিতে আন্দ্রনা আঁকা হচ্ছে।

রাজিম, আমি কয়েকটা মাহ ধরে আগুনে স্নেহ করছিলাম। আমাদের

হৃদয়ের সেজাজই ভীষণ ঘটছে। আশপাশের সব কিছুই বেশ জীবন্ত, সুন্দর ও সহজ হয়ে উঠেছে। আর্মারের মনে কোন ভার ছিল না, করণের নির্মল, স্বচ্ছ। শূন্যে শূন্যে স্বপ্ন সেখে সময় কাটাতেই তখন আমাদের সবচেয়ে ভালো লাগছিল।

সমুদ্রটা বালির বুকে মৃদু গর্জে নিশ্চিন্তে পড়ে আছে। স্টেটসম্যান গোষ্ঠার শূন্যে মনে হ'ল তারা যেন আমাদের আগমনের উদ্দেশ্যে কিছুটা অংশ প্রার্থনা করছে। সেই গোষ্ঠার ছাপেরে একটা সুন্দর, মিষ্টি নাটকীয় রূপ ধীরে সময় ধরে আমাদের কানে ভেসে আসছিল। বুঝে সম্ভব তা আমাদের পায়ের কাছে আছড়ে পড়া টেউ-এরই আত্মনাম।

শূন্যে থাকা রাজসের দৃষ্টি সমুদ্রের দিকে। কনুই অনেকটা বালিতে ডোবা, মাথাটা সবচেয়ে দৃঢ় হাতের ওপর রাখা। নির্বিরল চিন্তে ধরে তাকিয়ে আছে রাজস। চুপচাপ মাথার পেছন দিকে হেলানো। ভেড়ার চামড়ায় তৈরী গুটা। বিশুদ্ধ বাতাস তার বলিরেখা সহজ, প্রশান্ত, স্বচ্ছ, কপালে আলতো চুমু খেয়ে যাচ্ছে। দেখে মনে হয় আপাততঃ সে কিছু দার্শনিক চিন্তার বিভোর। হঠাৎ সে বকতে শুরু করল। আমি শুনছি কি শুনছি না, তার বিশ্বাস্যতা খেরাল নেই। ভাবটা এই যেন সমুদ্রের সঙ্গে বাক্যলাপ হচ্ছে! 'যে পবিত্র বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহর সেবা করে সে বেহেস্তে যাবে। কিন্তু যে আল্লাহ বা নবীর সেবা করেনা তার পরিণতিটা কী? হয়তো সমুদ্রের বুকে গুরুত্ব ফেনা হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়! হয়তো ওরাই জলে রূপের মত চিকচিক করছে? কে জানে!'

চাঁদের আলো সমুদ্রের বুকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ার অশ্বকার এখন অনেকটা হালকা। পাহাড়ের পেছন থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা চাঁদ বিস্তীর্ণ বেলোভীমতে আলো ছড়াচ্ছে। পাথরটাকে ঘিরে যে অশ্বকার এতক্ষণ ছিল, এখন তাও তেমন নেই।

আমি বুকের বসন্তাম, 'রাজস, একটা গল্প শোনাও।' সে মাথা না কিলিয়েই প্রশ্ন করল, 'কেন?'

'কেন আবাবু কি? তোমার গল্প শুনতে আমার ভালো লাগে তাই।'
'আমি যা গল্প জানি তার সবই তোমায় বলছি। আর তু জানি নে।'

রাজসম্মেলন হচ্ছে, আমি তাকে একটু খোসামোদ করি—করলামও।

সে রাজী হয়ে বলল, 'খব চাও তবে একটা গান তোমার শোনাতে পারি।'

তার পুরণো গানের প্রায় সবকটাই আমার খুব ভালো লাগে। তাই প্রস্তাব শুনে ভীষণ আনন্দ পেলাম।

লোকসঙ্গীতের স্বভাব ধরে রাখবার জন্য রাজসম্মেলন বেশ খেলিয়ে খেলিয়ে একটা গান গাইতে আরম্ভ করল।

অনেকটা উঁচু দ্বিধে একটা সাপ বৃকে হেঁটে হেঁটে পাথরটার শেষ প্রান্তে এল। এসে মাথা নীচু করে তাকিয়ে রইল সমুদ্রের দিকে।

তখন মাথার ওপরে সূর্য জ্বলছে। পাহাড়ের উত্তম নিবাস ভূমণ্ডল ছাড়িয়ে ক্রমশ সর্বত্র ছাড়িয়ে পড়তে লাগল। আর তখন নীচে একটার পর একটা ডেউ পাথরের ওপর অবিস্রাস্ত শব্দে আছড়ে পড়ছিল।

পাথরের মাঝখানে হাঁ-করা অংশটা দ্বিধে অশ্রুকার কুয়াশা ভেদ করে একটা নদী বয়ে চলেছে। সমুদ্রে নামবার সময় স্রোতের বেগ এত বেশী যে তাতে অনেক পাথরই সমুদ্রে উৎপাটিত হয়।

জমাট ফেনাপ্রবাহের আঘাতে নদী পাথর কাটে এবং ক্রমশ গর্জন করতে করতে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে।

হঠাৎ একটা বাজপাখী চিংকার করতে করতে আকাশ থেকে নীচে নেমে এল। নেমে সাপটা যেখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে সেখানে ঝাঁপাল। তার পাখা দুটো রক্তাক্ত এবং বৃকে একটা ক্ষত।

মাটিতে নেমেই পাখীটা ভয়ংকর জোরে আতর্নাদ করে উঠল। এবং এমন মরিয়া হয়ে পাখার ঝাপট দিতে লাগল যে সাপটা ভয় পেয়ে খানিকটা সরে এল। কিন্তু চাকিতেই বৃকতে পারল পাখীটাকে ভয় পাবার কিছু নেই। ওর অবস্থা বিশেষ স্তব্ধের নয়। মিনিট করেকের মধ্যেই ওটা মরবে।

সুতরাং সে নির্ভর্যেই পাখীটার কাছাকাছি গিয়ে কুণ্ডলী পাকালো। এবং তার কানের কাছে হিসহিসিয়ে বলল, 'খুব শীগগিরই তুমি মরছ।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জবাব দিল পাখীটা, 'হ্যাঁ, আমার হয়ে এসেছে। কিন্তু আর—বেঁচে থাকা কাকে বলে তাতো জানা হল। আর সুখ? তার

স্বয়ং পেরেছি। অবশ্য এর জন্য লড়াইও করা করতে হয় নি। সমস্ত আকাশ জুড়ে আমি উড়েছি—কেল উড়েছি। কিন্তু তোমাকে দেখে আমার হৃদয় হচ্ছে। কোরা! তুমিও কোর্সবিনও আমার মত অসীম আকাশ দেখতে পাবে না।’

‘আকাশ? সে আবার কি? আমার ওসবের কোন প্রয়োজন নেই। ওখানে কি আমি এভাবে কুন্ডলী পাঁকিয়ে আরামে পড়ে থাকতে পারতাম? তার চেয়ে এই আমার ঘের ভালো।’

সাপটি স্বাধীনচেতা বাজপাখীটিকে এইসব বলে চলল। পাখীটির এইসব বীরবন্দুর্প আশ্চর্যজন শব্দে মনে মনে বিস্ময়ের হাসিও তার কম পেল না।

ভাবতে লাগল নিজের মনে, ‘কেউ উড়ল না হামাগুড়ি দিল কী এসে যায় তাতে? সবাইই শেষ পরিণতি এই মাটির আজর।’

হঠাৎ পাখীটা মাথা নীচু করে নিজের বুকের কতর দিকে চাইল।

পাখির চোঁইয়ে চোঁইয়ে জল পড়ছে। বারমন্ডল ততক্ষণে মৃত্যু ও ধ্বংসের আঁতড়ে ভারী।

বসন্তগার পাখীটি আতঁনাথ করে উঠল।

‘আঃ, আকাশে উড়ে বেড়ানোটা যে কী মজার, স্বাধীন! আর একবার—আর একটিবার যদি উড়তে পারতাম।’ হঠাৎ তার সমস্ত শরীরটা কঠিন হয়ে উঠল, ‘ধরব, ধরব, শত্রুকে আমি ধরবই। তারপর তার মাথাটা আমার এই হুক দিয়ে বেঁতলে দেব। আঃ, যদি শত্রুর রক্ত দিয়ে জায়গাটা একবার ধুয়ে দিতে পারতাম। লড়াই—লড়াই...লড়াই ছাড়া কোথাও সুখ নেই।’

সাপটা মূহুর্তের মধ্যে ভেবে ঠিক করে ফেলেছে যে আকাশ-বিহারের ভাবনাটা মোটেই কাজের নয়। পাখীটির ওপর যথেষ্ট বিরক্তও হল সে। বসন্ত গম্ভীরপাল করছে।

পাখীটিকে বলল, ‘যাও না এই খাড়া পখটা বেয়ে আর একটু ওপরে উঠে যাও। তারপর ছুঁড়ে ধাও নিজেকে। হয়তো তোমার পাখা এখনও তোরবার ভাঁড়িয়ে নিরে বেড়াবে। সত্যি, আকাশ বলে কথা।’

পাখীটি খুব উত্তেজনার সুরে কঠোরছে। ইচ্ছে কর্তেই চোঁচাল সে।

সম্বাই ফেন শুনতে পার। চেঁচিয়ে মনে মনে একই গর্বও হোল। তারপর
হঠাৎ হামান্দীড়ি দিয়ে খড়্কা পকটা বেয়ে উঠতে লাগল।

শেষপ্রান্তে পৌঁছে সে তার পাখা হুটোকে বড়টা সড়ন ছাড়িয়ে দিল।
তারপর অনেকটা লম্বা করে একটা শ্যাল ফেলে উজ্জল চোখ মেলে অন্যত
আকাশের দিকে তাকাল।

হঠাৎ পাখরটা নীচে গড়িয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে পাখীটাও। এবং
তার ডানা হুটো ভেঙ্গে গেল।

একটা ছোট এসে তার শরীরের সমস্ত রক্ত মূছে দিয়ে গেল। সর্বাস্থে তার
ফেনা। পরের ছোটটা তাকে টেনে-হেঁচড়ে সমুদ্রে নিয়ে গেল।

পাথরে ভেঙ্গে যাওয়া শোকসন্তপ্ত ছোট পাখীটাকে যে কোথায় ভাসিয়ে
নিয়ে গেল, বিপদল, বিস্তীর্ণ সমুদ্রের দৃষ্টিসীমার আর তাকে দেখা গেল না।

(২)

অনেকক্ষণ যাবৎ সাপাটি ঐ গর্তের মধ্যে কুন্ডলী পাকিয়ে পড়ে রইল
আর ভাবতে লাগল পাখীটির মৃত্যুর কথা। আকাশের জন্য কী ভীষণ
ভালোবাসাই না তার ছিল।

তারপর একসময় সে চোখ তুলে মাথার ওপর আকাশের দিকে তাকাল—
ওখানেই তো এক চণ্ডল, অস্থির চিত্ত-স্বথের খোঁজ পেয়েছিল।

‘কিন্তু বেচারী পাখীটি কি করে ওখানে স্বথের খোঁজ পেল? ঐ
মহান্যাতার মধ্যে? উঃ! এই হতভাগারা নিজেরাও উদ্ভাব, আর উদ্ভাবনা
দিয়ে অন্যের শাস্তিও কেড়ে নেয়। ওখানে আছেটা কী? আর বহি কিছু
থাকেও তার জন্য সামান্য কিছুদূর উড়ে এলেই যথেষ্ট।’

নিজের মনে মনে বিড়বিড় করতে করতে সাপটা আরও কঠিন পাশে কুন্ডলী
পাকিয়ে নিজেকে বাঁধল। তারপর লাফ দিল সেই শূন্যতার মধ্যে। যখন
সাব্য, জলন্ত সুবর্ণের মধ্যে কালো অকার্বিকা রেখা কলসে উঠল।

কিন্তু বারো সন্ন্যাসে তারা কোনদিকও উড়তে পারে না। সাপটাও
না। ধপাল করে পাথরের উপর পড়ল।

অন্যভাবে পড়েও তার হাসি পেল।

‘উড়ে বেড়ানোর মজা তাহলে এই ! পতনের সূখ ! উঃ, পাখীদেরো কি সূখ’ । মাটিতে সূখ পার না, আর জ্বালনা করেই পাখীরা মেলে আকাশে উড়তে চায়—এ বিতর্কী মহাশয়ের বাল করতে চায় ! শূন্য ছাড়া ওটা আবার কি ? অক্লান্ত আলো অবশ্য আছে কিন্তু শরীরের কোন কাজই তা লাগে না। তবে বাপু এত অহংকার কেন ? আর এত বিতর্কই বা কিসের ? এগুলো হল ওদের উদ্ভাবনা এবং জীবনযাত্রার অসংগতকে জনসমক্ষে আড়াল রাখার একটা কৌশলমাত্র । উন্মত্ত এক পাখী ! আর বাপু তোমার কথার ভুলটি না ! অনেক ফাঁকি দিয়েছ । তোমাকে বুঝতে আর আমার বাকী নেই । আকাশ ত’ দেখলাম । আমিও গিরোহিলাম ওখানে । কিন্তু কী হলো ? ওখান থেকে পড়লাম নীচে । বন্ধিও প্রাণে বেঁচে গিয়েছি ! এই সব শক্তিমানেরা দেখছি আমার আত্মবিশ্বাস হ্রাসই বাড়িয়ে দিচ্ছে । থাক, মাটিকে বারো ভালোবাসে না, তারা বাকি এ আকাশের মোহে । ওসব পাখী-টাখীদের আশ্চর্যজনক আর কখনও সমীহ করছি না । শালা জন্মেছি যখন মাটিতে, মাটিতেই থাকব ।’

এইসব আওড়াতে আওড়াতে সাপটা আবার পাখরের ওপর কুন্ডলী পাকালো । তার বৃকের ছাঁতি এখন অনেকটা ফুলে উঠেছে আত্মতৃপ্তিতে ।

সমুদ্র রূপালী আলোর কলমল করছে । এবং জ্বলন্ত ঢেউগুলো ভীমগর্জনে তীরে আহুড়ে পড়ছে ।

সেই সিংহগর্জনের মধ্য দিয়ে বাজপাখীটির গান ভেসে আসতে লাগল । টেউ-এর আঘাতে কেঁপে উঠল পাখরগুলো । সঙ্গীতের কক্বারে আকাশ কম্পিত ।

‘এক ক্যাপা দুঃসাহসীর উদ্দেশ্যে আমরা একটা গান গাইছি ।’

‘দুঃসাহসীদের উদ্ভাবনাই হচ্ছে জীবনে একমাত্র সত্য । হে বীর ! তুমি শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে রক্ত করিয়েছ । কিন্তু এমন দিন আসবেই যখন তোমার রক্তের প্রতিটি বিন্দু জীবনের বিবরণতার মধ্যেও চিরউজ্জ্বল হয়ে থাকবে । এবং সমস্ত দুঃসাহসীদের অন্তরে অরুণোদয় ও স্বাধীনতার আগুন জ্বালিয়ে দেবে ।’

‘তুমি তোমার জীবন দিয়ে সব ঋণ শোধ করছে । কিন্তু সমস্ত বোধ্য রক্তস্রবের মধ্যে তুমি বেঁচে থাকবে । বেঁচে থাকবে স্বাধীনতা ও

সমুদ্রের সঙ্গরসের মধ্য দিয়ে ।’

‘এসো আমরা সবাই এই বেগেরেছা বৃন্দাঙ্গীর উদ্দেশ্যে একটা গান গাই ।’

...সমুদ্র এখন শান্ত । ঢেউ-এর মৃদু গুঞ্জন ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই । আমি চুপ করে সামনের দিকে যথাসম্ভব ঘৃষ্ণিত প্রসারিত করে রইলাম । জ্যোৎস্না ঘন হয়েছে । সমুদ্রের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এখন জ্যোৎস্না খেলা করছে । কানে ভেসে আসছে কেটলীর মৃদু নিঃশ্বাসের শব্দ ।

একটা ঢেউ রাজিমের মাথার কাছে এসে আছড়ে পড়ল । রাজিম উল্লসে চৌঁচরে উঠল,

‘ফিরে যাও । কোথায় যাবে ভাবছ ?’

রাজিম হাত নাড়ল । ডেউগুলো বাধা ছেলের মত ঘুরে ঘুরে ফিরে গেল ।

সমুদ্রের তরঙ্গমালায় রাজিম জীবন-বর্ণন খুঁজে পেল । আমি অবশ্য তার মধ্যে মজার বা চমকপ্রদ কিছুই পাই নি । আমাদের ব্যাপার-সাপার অস্বস্ত রকমের সজীব, স্বতঃস্ফূর্ত, অবিচল এবং প্রীতিকর ছিল । নীরব সমুদ্রের বৃক চেয়ে ঠান্ডা বাতাস পাহাড়ের মাথাগুলো আলতো করে ঘুরে যাচ্ছে । কেন যেন মনে হল সেখানে এক অস্বস্ত শক্তি আছে । নীল অশ্বকাব আকাশের বৃকে নক্ষত্রেরা এমন এক পবিত্র বানী খুঁজে পেয়েছে বা আত্মাকে সমৃদ্ধ করে । হ্রস্বকে কোনো কার্পিক্ত বানীর জন্য উন্মুখ করে তোলে ।

সবকিছুই কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন । অথচ বেশ সচেতন । যেন সবাই জেনে গেছে যে এমন একটা মৃদুত্ব অচিরেই আসবে যখন সবাইকে গা কাড়া দিয়ে বসে কন্ঠে কন্ঠ মিলিয়ে গাইতে হবে । সেই গান, সেই সুর জীবনের রহস্যের কথা বলবে, ব্যাখ্যা দিয়ে মনের সব জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়িয়ে দেবে এবং আত্মাকে ঐ নীল মহাকাশের দিকে ধাবিত করবে । ওখানে সমস্ত নক্ষত্ররাই সর্বদা মধুর, স্বর্গীয় সঙ্গীত গায় ।